



- আমাদের শিক্ষার নৈতিক দীনতা ও একজন ডায়োজিনিস
- মিমার সিনান : বিস্ময়কর এক প্রতিভার নাম
- তামাশার শহরে দুইদিন (আখেরি কিস্তি)
- আর্থিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার সমন্বয়
- এখন আর বঙ্গবন্ধুর চর্চা হয় না

সাহিত্য

সংগত

রবিউস সানি সংখ্যা

১৪৪২

সূচী

কবিতা

মেঘ : হাসান রোবায়ত

অরণ্য : সাদিয়া জান্নাত মুনমুন

স্মৃতিকথা ও ভ্রমণ

স্মৃতিবিলাস ৪র্থ পর্ব : জিনাতুননেছা জিনাত

তামাশার শহরে দুইদিন : মো. রেজাউল করিম

প্রবন্ধ

আমাদের শিক্ষার নৈতিক দীনতা ও একজন ডায়োজিনিস : জাহিদুর রহিম

এখন আর বঙ্গবন্ধুর চর্চা হয় না : আসিফ উল আলম সৈকত

Science of purifying the heart: Rashedul Bari

মিশ্রগদ্য

মিমার সিনান : বিশ্বয়কর এক প্রতিভার নাম : মঈনুল কাদের

মাস্টার আবুল কাশেম: অনবদ্য এক পথিকৃৎ : হাফেয তামজিদ খান

কয়েকজন বিখ্যাত সুফি সাধক এবং ফকির উল্লাস : এম এয়াকুব আলী বাদশা

গ্রন্থালোচনা

আধো ঘুমে ক্যাস্ট্রোর সঙ্গে : মিঠুন সরকার

সাইয়েদুল মুরসালীন : মাসুক আহমেদ

মাধুভাঙাতীরে : মুহাম্মদ আবু সাঈদ

পছন্দের লিখাটি পড়তে
শিরোনামের উপর ক্লিক করুন

কালোত্তীর্ণ

সংবাদপত্র ও জনমত : শওকত ওসমান

আর্থিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার সমন্বয় : খান বাহাদুর

আহছানউল্লা

শ্রদ্ধা ও স্মরণ

বুদ্ধদেব বসু

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মুনীর চৌধুরী

সাহিত্য সংগত

রবিউস সানি ১৪৪২ | অগ্রহায়ন ১৪২৭



চলছে হিজরি সনের দ্বিতীয় বসন্ত। *সংগত* এই সংখ্যা থেকে *সাহিত্য সংগত* নামেই প্রকাশিত হবে। কপিরাইট আইনের ঝামেলা থেকে আমাদের প্রিয় *সংগত*কে দূরে রাখতেই এই উদ্যোগ। শব্দের ব্যপকতা ও গভীরতার কথা ভেবেই *সাহিত্য* শব্দটিকে আমরা নির্বাচন করেছি। সত্যের সাহিত্যের *সংগত*ে ভরে উঠুক প্রত্যেকের জ্ঞান ভাণ্ডার।

গত দুই পর্ব পেরিয়ে *তামাশার শহরে দুইদিন* এবারে তৃতীয় পর্বে সমাপ্ত হচ্ছে। এ ভ্রমণগদ্যটি পড়ে কেমন লেগেছে সে অনুভূতি পাঠক জানাবেন এবং কড়া সমালোচনাও আমাদের কাম্য। জ্ঞানতাপস আব্দুর রাজ্জাকের মৃত্যুবার্ষিকীকে স্মরণ করে পুনঃপ্রকাশ হলো বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক জাহিদুর রহিমের *আমাদের শিক্ষার নৈতিক দীনতা ও একজন ডায়োজিনিস* প্রবন্ধটি; প্রবন্ধের শেষে যে তিনটি বইয়ের উল্লেখ আছে সেগুলোর মাধ্যমে পাঠক উক্ত জ্ঞানতাপসের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পারেন। *এখন আর বঙ্গবন্ধুর চর্চা হয় না* লেখাটির সাহিত্যিক উৎকর্ষতা, আকর্ষণক্ষমতা ইত্যাদির ব্যাপারে চুপ থেকে কেবল বলতে চাই: বর্তমান সমাজের উত্তম পরিস্থিতির মধ্যে লেখাটি প্রয়োজনে যেমন অবশ্যস্বাবী ছিল, চাহিদায়ও তেমন- কারণ সকলে পূজায় অভ্যস্ত নন। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় লেখকের সাহসিকতা সাধারণ নয়, প্রশংসনীয় অবশ্যই। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বর্তমান সংখ্যা থেকে প্রতি সংখ্যায় ইংরেজি ভাষায় রচিত গদ্য, প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প অর্থাৎ যে কোনো রচনা প্রকাশ করবো। আমরা আশা করছি, পাঠকগণ সৃষ্টিশীল রচনা, সমালোচনা ইত্যাদি প্রদানের মাধ্যমে সহযোগিতা করবেন। গ্রন্থালোচনা বিভাগে যে তিনটি কেতাবের আলোচনা প্রকাশিত হলো তিনটিই পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করেছে অলরেডি, বিশেষত *সাইয়েদুল মুরসালীন*। বুদ্ধদেব বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মুনীর চৌধুরী- এ তিনজন বিখ্যাত সাহিত্যিককে স্মরণ করেছি, বিভিন্ন ব্যক্তিদের যৌক্তিক মন্তব্যের মাধ্যমে।

সম্পাদক

আসিফ উল আলম সৈকত
মোহাম্মদ আবু সাঈদ

প্রচ্ছদ

শেখ আল.ম হুমাইর কায়সান

অঙ্গসজ্জা

সাঈদ মাহমুদ সোহরাব

মূল্য:

পাঠকের তৃপ্তির উপহার

বিকাশ: 01878-431312 (পার্সোনাল)

মেঘ

হাসান রোবায়েত

তখন দুপুর বাবলা পাতা
দিঘিতে হাঁস ওড়ে
কামরাঙা ফুল ছায়ায় ভেজে
নিধুয়া মন পোড়ে

অনেক কালের জলেশ্বরী
হাওয়াই মিঠাই জামা
বৃষ্টি তোমায় ভেজায় যেন
ভিজছে শাহানামা

মসনভিতে মেঘ করেছে
সহজ পাতার পাশে
ভাষার দূরে অর্থ রেখে
আসলো ঘরে না সে—

লেখক: জন্ম ১৯ আগস্ট, ১৯৮৯; বগুড়া। শিক্ষা : পুলিশ লাইন্স হাইস্কুল, বগুড়া। সরকারী আজিজুল হক কলেজ; বগুড়া। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রকাশিত বই — ঘুমন্ত মার্কারি ফুলে [কবিতা; চৈতন্য, ২০১৬] ঘুমন্ত মার্কারি ফুলে [ভারতীয় সংস্করণ, বৈভাষিক, ২০১৮] মীনগন্ধের তারা [কবিতা; জেরাক্রসিং, ২০১৮] আনোখা নদী [কবিতা; তবুও প্রয়াস, কলকাতা, ২০১৮] এমন ঘনঘোর ফ্যাসিবাদে [কবিতা; ঢাকাপ্রকাশ, ২০১৮] মাধুডাঙাতীরে [কবিতা; ঐতিহ্য, ২০২০] ই-মেইল : hrobayet2676@gmail.com

অরণ্য

সাদিয়ো জাঙ্গাত মুন্মুন



অরণ্যের এই অপূর্বতায়
উতলা হয় মন,
পাখিপাখালির কুঞ্জনেতে
মাতি সারাক্ষণ।

ফুলে ফলে লতা পাতায়
হরেক রকম সাজ,
লজ্জাবতী গাছে যেনো
জুড়ে সকল লাজ।

হিমেল হাওয়ার মাঝে যেনো
ভাসে নানান সুর,
রাখালিয়া বাজায় বাঁশি
দূরে বহু দূর।

ভাগীরথীর তীরটা ঘেঁষে
কল্লোল উঠে রোজ,
বয়ে চলে সাগর পানে
স্বর্গের করে খোঁজ।

প্রকৃতির এই দৃশ্য তটে
বিমুগ্ধ হই বেশ,
দু-চোখ জুড়ে যতই দেখি
দেখার নেই তো শেষ।

স্মৃতিবিলাস (পর্ব ৪)

জিন্মাতুন্নোহা জিন্মাত

আজকাল অনেকেই জানতে চান- কী হতে চেয়েছিলেন? কী হলেন? ছেলেবেলার সেই স্বপ্ন বা অপূর্ণ স্বপ্নের কথা বলি তবে- শিশুকালে আমার সঙ্গী অনেকেই পুতুল নিয়ে খেলতে পছন্দ করতো, কিন্তু আমার দোকানদার সাজতে খুব ভালো লাগতো। পুকুরের পাড় থেকে মাটি তুলে হাত দিয়ে বিভিন্ন আকৃতির মিষ্টি তৈরী করতাম, সেগুলো রোদে শুকিয়ে একটু শক্ত হলে তারপর লম্বা মিষ্টিগুলোর গায়ে ইটের গুঁড়া মাখিয়ে চমচম আর গোল মিষ্টিগুলোর গায়ে গুঁড়া চুন মাখিয়ে রসগোল্লা নাম দিতাম। রসগোল্লাগুলোকে আবার বাটিতে পানি দিয়ে রসে ভেজাতাম। পানের দোকান দিতেও খুব ভালো লাগতো। বাড়ির পেছনদিকের বাগানে এক ধরণের লতানো গাছ পাওয়া যেতো, যার আঞ্চলিক নাম জার্মানির লতা, এই গাছের পাতাগুলো দেখতে অনেকটা পানপাতার মতো। সেই পাতাগুলো বোটাসহ ছিঁড়ে উল্টো করে করে সাজিয়ে রাখতাম, খেজুরের বীচি দিয়ে সুপারি বানাতাম, একটা কাপড় বা চট ভাঁজ করে বিছিয়ে তার উপর বসতাম। চটের ভাঁজে কাগজের কৃত্তিম টাকাগুলোকে বিভিন্ন আকার অনুযায়ী মহাজনের মতো সাজিয়ে রাখতাম! স্কুলে ভর্তি হবার পর স্যার, আপারা বেশ আদর করতেন, কারণ আমি বরাবরই শ্রেণিতে প্রথম হতাম। পরবর্তীতে বিজ্ঞান বিভাগে পড়ার কারণে সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী স্কুলের শিক্ষকরা ডাক্তার বা ইন্জিনিয়ার হবার স্বপ্ন দেখাতেন। আমাদের দশ ভাই-বোনের সংসারে তখন পেশা নির্বাচনের কথাটা মাথার উপর দিয়ে চলে যেতো কারণ নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে সবকিছু সামলে শেষ পর্যন্ত পড়াশোনাটা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে

কি না, সেই দুরাশা-ই তখন জোরালোভাবে জায়গা করে নিয়েছিল মনের ভেতর। কলেজে ভর্তি হবার পর অশোক স্যার আমার ইংরেজির প্রতি আকর্ষণ দেখে আঝাকে ডেকে বলেছিলেন, “মেয়েটাকে ইংরেজি সাহিত্যে পড়াবেন, সে চেষ্টা করলে ইংরেজির ভালো শিক্ষক হতে পারবে।” কিছুদিনের জন্য সেটাই তখন স্বপ্নে পরিণত হয়েছিল। এইচএসসি পরীক্ষার পর উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি হওয়া নিয়ে আবার ঝামেলা শুরু হলো। আঝা দূরে কোথাও ভর্তি করাতে রাজি নন। তাছাড়া আবার বড় পাঁচ বোনেরই এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষার পরপরই বিয়ে হয়ে গেছে, সেসব নিয়ে বেশ দুঃশ্চিন্তা হতো, মনে হতো দূরে গিয়ে পড়ার বিষয়ে জোর করলে আঝা যদি আবার বিয়ে দিয়ে দেন! তারচেয়ে খুলনাতেই পড়তে রাজি হয়ে গেলাম, প্রাণিবিজ্ঞানে অনার্স। ভেতরে ভেতরে খুব আফসোস হতো, ইস! যদি আমাকে মেডিকলে একটিবার ভর্তি পরীক্ষা দিতে দিতো অথবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে! বিয়ের আগেই অনার্স, মাস্টার্স শেষ করলাম। মাস্টার্স পরীক্ষার এক মাসের মধ্যে বিয়ে হয়ে গেলো, ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারিতে। স্বামী ভদ্রলোক, অত্যন্ত ভালো মানুষ! সে যেন আমার মনের আকৃতির কথা বুঝতে পারতো। ঘরের কাজকর্ম বা নতুন নতুন রেসিপি নিয়ে রান্না-বান্না করতে গেলে সবসময় বলতো, ‘তুমি পড়াশোনা জানা মেয়ে, শুধু ঘরের কাজ করে সময় নষ্ট করো না, চারিদিকে চোখ কান খোলা রেখে দেখো, অনেক কিছু করার আছে তোমার, যেটা ভালো লাগে সেটাই করার চেষ্টা করবে।’ ওর মুখে কথাগুলো শুনে খুব ভালো

লেগেছিল সেদিন। সাহস করে বলেছিলাম, ‘আমি আরও পড়তে চাই।’ সেও খুশি হয়ে বলেছিল, ‘ঠিক আছে।’ কুমিল্লায় বাসা ভাড়া নিয়ে সংসার জীবন শুরু করলাম ২০০১ সালে। একা একা বাসায় থেকে সারাদিন সময় আর কাটে না। এক সপ্তাহ পর থেকেই বায়না শুরু করলাম, ‘কিছু একটা করতে চাই।’ সেও হন্যে হয়ে বউয়ের জন্য খোঁজ শুরু করে দিল, কোথায় কী করানো যায়। সে বছরই ভর্তি হলাম কুমিল্লা সরকারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজে, বিএড-এ। আমাদের বাসা ছিল শুভপুর, সেখান থেকে রিকশায় করে টমছমব্রিজ যেতে হতো। ওখান থেকে বাস বা বেবিট্যাক্সিতে চড়ে টিটি কলেজে যেতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগতো। বিকেল পাঁচটায় ক্লাস শেষ করে আবার একই নিয়মে বাসায় ফিরতে ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা। রাতে রান্না-বান্না শেষ করে পড়তে বসতে হতো। ওখানেও পাঁচজন মনের মতো বন্ধু খুঁজে পেয়েছিলাম, রুপা, মুনা, সোমা, অনু ও শিমুল। এরমধ্যে তিনজনই নতুন সংসার শুরু করেছি তখন, সবাই সবাইকে খুব ভালো বুঝতাম, মিলেমিশে পড়াশুনা করতাম, নোটগুলো একে অন্যের সাথে শেয়ার করতাম। সবকিছু মিলিয়ে কষ্টগুলো অনুভব করিনি কখনও। সেখানেও আমার ভালো রেজাল্ট হলো, স্কলারশিপ পেয়েছিলাম। তখনও খেলাধুলা, আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা... সবই করতাম। ওখানকার শিক্ষকদের কেউ কেউ ভাইবা বোর্ডেও প্রশ্ন করা বাদ দিয়ে আবৃত্তি শুনতে চেয়েছিলেন। বিদায়বেলা প্রিয় শিক্ষকদের কमेंটসগুলো আমার মনের মধ্যে তখনই পেশা নির্ধারণের জন্য স্বপ্নের বীজ বপন করে দিয়েছিল, বিশেষ করে মাইনুদ্দিন স্যারের কথাটা, “আপনি যদি শিক্ষকতা পেশায় না আসেন, তাহলে দেশ একজন ভালো শিক্ষককে হারাবে।” কুমিল্লা থেকে প্রচুর আত্মশক্তি জমিয়ে নিয়ে ২০০৩ সালে ঢাকায় এলাম, চাকরির জন্য পড়াশুনা শুরু করেছি তখন নতুন উদ্যমে। বিসিএস-এর জন্য প্রস্তুত হতে

হবে, আমার চেপ্টার কোন কমতি ছিলনা কখনও, আর আমার হাজব্যান্ড অনু, এমন বিশ্বস্ত, পরোপকারী বন্ধু পাশে থাকলে হাজার আলোকবর্ষ হেঁটে পাড়ি দেয়া যায়। যখন যে বই দরকার হয়েছে, বলার সাথেসাথেই হাজির করেছে, ২৪তম বিসিএস এর শেষ পর্যন্ত গিয়েছিলাম, মৌখিক পরীক্ষাও খারাপ হয়নি, আমি প্রায় ৯৯% নিশ্চিত ছিলাম, চাকরিটা হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হলো না, টানা তিন বছরের চেপ্টা বিফলে গেল! আমার ভাগ্যে ছিল না হয়ত। সেবার ভেতরে ভেতরে আমি খুব ভেঙে পড়েছিলাম, মনে হতো আমাকে দিয়ে কিছু হবে না! কাউকে কিছু না বলে একাই বায়োডাটা তৈরী করে কাগজপত্র রেডি করলাম অনেকগুলো, মনেমনে স্থির করলাম, আশেপাশের যত স্কুল-কলেজ আছে, নিজে গিয়ে সেখানে বায়োডাটা দিয়ে আসবো, মানসিক অস্থিরতা থেকে পরিত্রাণ দরকার। কিছু একটা করতেই হবে। মধুবাগে বাসা ছিল তখন, একদিন দুপুরে বাসার সল্লিকটে অবস্থিত ‘শহীদ (লেঃ) সেলিম স্কুল এন্ড কলেজে’ গিয়ে অফিসরুমে বায়োডাটা জমা দিয়ে এলাম। বাসায় এসে কেবল দুপুরের খাবার খেতে বসেছি, এরমধ্যে ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ফোন করেছেন, ‘আপনি কি এখন একটু আসতে পারবেন?’ ‘এখনই?’ ‘জি, এখন আসলে ভালো হয়।’ ‘আচ্ছা, আসছি।’ যাবার পর একটা কাগজে লেখা গণিত প্রশ্ন দিয়ে উপস্থিত মতো আমার একটা পরীক্ষা নেয়া হলো, এরপর একঘণ্টা বসিয়ে রেখেছিলেন। সন্ধ্যায় একেবারে জয়েন করেই বাসায় ফিরলাম। মাত্র ১৫০০ টাকা বেতনে চাকরি শুরু করলাম। কিছুদিন পরে অবশ্য একটা ক্লাসের সার্বিক দায়িত্ব পালন করার জন্য বেতন বাড়িয়ে ৩০০০ টাকা করা হয়েছিল। স্বল্প বেতন ছিল ঠিকই, কিন্তু সেটা কখনও মাথায় রাখিনি, নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছি। তাইতো চলে আসার পনের বছর পরেও সেখানকার সহকর্মীরা একইভাবে মনে রেখেছে আমায়,

প্রতিষ্ঠানের বর্ষপূর্তিতে বা স্কুলের কোন ভালো-মন্দ সময়ে ঠিকই আমাকে মনে পড়ে তাদের! ২০০৫ সালের শেষ দিকে ইম্পাহানি গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ এর মগবাজার শাখায় কলেজ সেকশনে জয়েন করি। মাত্র তিনমাস সেখানে চাকরি করার সুযোগ হয়েছিল, কারণ কিছুদিন পরই ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের সার্কুলারটা চোখে পড়ে। নানারকম যাচাই বাছাইয়ের পর চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হই। ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে পেলাম ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের মতো ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানে মানুষ গড়ার দায়িত্ব! একই দিনে দুটো বিশেষ ক্ষণ পালনের সুযোগ আসে আমার জীবনে। ২০০৭ সালেই ভর্তি হলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, এম এড করলাম। টানা দুটো বছর

সংসার, চাকরির পাশাপাশি বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া-আসা, সব মিলিয়ে প্রচুর কষ্ট করতে হতো, কষ্টগুলো কোথায় যেন মিলিয়ে গেল যখন দেখলাম ফলাফল প্রথম শ্রেণিতে প্রথম। আজও পেছন ফিরে তাকালে একটাই শুধু আফসোস, মনে হয় সুযোগ পেলে হয়তো আরও ভালো কিছু করতে পারতাম জীবনে। এখনও তাই যে কাজটাই করি, শতভাগ চেষ্টা করি সবসময়, অন্তত কোনো আফসোস যেন আর না থাকে।

১১/১১/২০২০

(চলবে)

লেখক:

বিএসসি (অনার্স), এমএসসি, বি এড (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়), এম. এড (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) সিনিয়র শিক্ষক, ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ।

প্রকাশিত গ্রন্থ- ‘ক্যান্সারের সাথে যুদ্ধ : একজন জয়িতার গল্প’ (আত্মজীবনীমূলক), এছাড়াও রয়েছে ২টি উপন্যাস, ২টি গল্পগ্রন্থ, একটি ধর্মীয় গ্রন্থ। প্রথম কাব্যগ্রন্থ- ‘তোমার মতো কেউ ভালো নয়’; প্রকাশিতব্য দ্বিতীয় একক কাব্যগ্রন্থ: কবির জন্য কবিতা (বিশ্বসাহিত্য ভবন প্রকাশনী)।

তামাশার শহরে দুইদিন (পর্ব তিন)

মো. রেজাউল করিম

আমাদের ভোজন-পর্ব শেষ। কাল সকালে প্রাতঃরাশ কালে দেখা হবে বলে উঠে দাঁড়ালাম। সন্ধ্যা হয়েছে। ওয়াকিং স্ট্রিট জীবন ফিরে পেয়েছে। এখানে দাঁড়িয়ে থাকা, হেঁটে বেড়ানো মানুষগুলোর জীবনে অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক কি নানা রঙের চোখ খাঁধানো আলোর ঝলকানিতে ম্রিয়মাণ হয়েছে? তা না হলেও সাময়িক অদৃশ্য হয়েছে।

সুভেনির শপগুলোতে খুব কম মানুষের ভিড়ই দেখা যায়। বরং জমজমাট হয়ে উঠছে ম্যাসাজ পারলার, রেস্টুরেন্ট, বার, গো গো বার, ডিসকো। প্রায় সব ধরনের বিনোদনকেন্দ্র থেকেই উচ্চশব্দের সংগীত কিংবা শুধু বাজনা বেজে আসছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে খাজনা ছাড়াই সংগীত ও বাজনা শোনা যায়। তবে তা এতই উচ্চকিত যে পাশাপাশি দুজন মানুষও কথা বলা দায়। আমাদের ঢাকাতে যেমন ফুটপাতে আজকাল চেয়ার পেতে চপপটি-ফুচকা খেতে দেয়া হয়। এখানে ফুটপাতে চেয়ারের সামনে টেবিলও রয়েছে। চেয়ারে যারা বসেছেন তারা চপপটি-ফুচকা নিয়ে বসেননি, তাদের হাতে দ্রাক্ষারসমঞ্জরী।

সংক্ষিপ্ত পোশাকধারী মক্ষিরানিরা দিনের আলোতে আসেন না। তারা আলো-আঁধারির জীবন বেছে নিয়েছেন। আলো-আঁধারিতে তারা যে নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন তাও না। কেউ ক্ষুদ্র আরশি হাতে নিয়ে রূপসজ্জা আরও শানিয়ে নিচ্ছেন। কেউ বা কিছু-না-কিছু খাচ্ছেন। কেউবা এককভাবে বা দলবদ্ধভাবে উত্তাল বাজনায় উদ্বেলিত হালকা নৃত্য পরিবেশন করছেন রাস্তার ওপরেই।

সালাহউদ্দিনের সাথে আগেই কথা ছিল রেডলাইট এলাকাতে আমরা যাব বটে কিন্তু বেশি দূরে এগুবো না। ইন্টারনেটে গতকাল রাতেই গভীর মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করেছি। দুটো বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত, বার থেকে শুরু করে সর্বত্রই লেনদেনের ব্যাপারে সতর্কতা। অর্থাৎ মূল্য যা বলবে সেবাগ্রহণের পরে ব্যাপারি তার চেয়ে বেশি দাবি করতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধের পরে যদি ব্যাপারি বলে সেবাগ্রহীতা মূল্য পরিশোধই করেননি, তাও বিচিত্র নয়। এই গ্যাড়াকলে আমাদের পতিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কেননা এই দুই সরলসিধে বাঙালি এসেছি শুধু দুই নয়নে এ পৃথিবীতে কত কি-ই না হয় তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একাংশ দর্শন করতে। কেনাকাটা বা কোনোরূপ সেবা গ্রহণের ইচ্ছে আদৌ নেই। দ্বিতীয়ত, যে বিষয়টাতে সতর্ক করা হয়েছে তা আমার জন্য খুবই বিব্রতকর বটে। এটা ওয়াকিং স্ট্রিট নয়- রেডলাইট এরিয়া। মক্ষিরানি এখানে হাত ধরে টানাটানি করতে পারে। এমনতরো পরিস্থিতিতে উদ্ভা প্রকাশ করা যাবে না। ইচ্ছে না হলে বদনম-লে ঈষৎ হাসি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিতে হবে, তবে এক ঝটকায় না- আশ্বে-ধীরে। খুবই উদ্বেগজনক। তবুও সালাহউদ্দিনের নয়ন জ্বালায় জল দিয়ে স্তিমিত করতে রেডলাইট এলাকাতে এসেছি। খুব সন্তর্পণে রাস্তার মাঝ বরাবর হাঁটছি। দু'পাশে এমনভাবে তাকাচ্ছি যে রমনা পার্কের বৃক্ষরাজি দেখছি মাত্র।

এই এলাকা আর ওয়াকিং স্ট্রিটের মাঝে অনেক পার্থক্য। এখানে কোনো সুভেনির শপ নেই। মূল পাতাইয়া শহর অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলেও এখানে ওসবের বালাই নেই।

এখানে মূলত মক্ষিরানিদের আধুনিক অ্যাপার্টমেন্ট, ক্যাসিনো, বার, ডিসকো, রেস্টুরেন্ট গিজগিজ করছে। পথের ওপরে যন্ত্রচালিত সুসজ্জিত ভ্যানগুলোতে নানারকম খাদ্যখানা তৈরি হচ্ছে। রমণীদের শরীরে পোশাক নেই বললেই চলে। রুশ-রমণীরা এখানে কিঞ্চিৎ আক্রমণাত্মক। সুদূর রাশিয়া কিংবা পূর্ব-ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশ থেকে এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এসেছে ওরা। আয়-রোজগার ভালো না হলে দেশে যাওয়ার বিমান ভাড়াও যে উঠবে না।

ব্যংককে আরব পুরুষদের একাকী কিংবা সস্ত্রীক ঘুরতে দেখেছি। এমনকি, স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়েই ম্যাসাজ পারলারে ঢুকতে দেখেছি। কিন্তু পাতাইয়ার রেডলাইট এলাকাতে তাদের দেখা পেলাম না। এই এলাকার অতিথি মূলত শ্বেতাঙ্গ ও ভারতীয় নাগরিক।

হাত-বিশেক দূরে রাস্তার মধ্যখানে রুশ-রমণীদের দলবদ্ধ নাচানাচি দেখে আর এগোতে বল পেলাম না। জিহ্বা শুকিয়ে আসছিল। মিথ্যে বলা মহাপাপ বটে। কিন্তু বিপদমুক্তির লক্ষ্যে তা বললে আল্লাহ নিশ্চয় ক্ষমা করবেন। ডাহা মিথ্যে বললাম, ‘সালাহউদ্দিন ভায়া আমার মাথা ঘুরছে। বোধ হয় ব্লাডপ্রেসার লো হয়ে গেছে। সারাদিন তো কম ধকল যায়নি। আমাকে একটু ধরবে?’

শেষ বাক্যটিতে সালাহউদ্দিন ভয় পেয়েছে। সে জানে আমি লো-ব্লাড প্রেসারের রোগী। সে ক্ষণিকমাত্র দেৱী না করে আমাকে ধরে রাস্তার পাশে একটি ভ্যান-রেস্টুরেন্টের চেয়ারে বসিয়ে দিল। মওকা বুঝে আমিও একটা সেভেন-আপ চাইলাম। দু’জন দুই ক্যান সেভেন-আপ খেয়ে চেয়ারে বসাটা জায়েজ করলাম। সালাহউদ্দিন খুব ভালো ছেলে। তার ঘাড়ে হাত দিয়ে বেরিয়ে এলাম। তখন রাত আটটা। একটা টুকটুক ডেকে বিচ রোডে একটা টার্কিস রেস্টুরেন্টে গেলাম। দুপুরে ভাত খাওয়া হয়নি, ভাত খেতে মন চায়। দুর্ভাগ্য টার্কিস রেস্টুরেন্টে টার্কিস স্টাইল ফ্লাইড রাইস তথা তুর্কি পোলাও

থাকলেও ভাত দিতে পারবে না। তুর্কি পোলাও এর সাথে নানা পদের আঞ্জাম নিতে হলো। কিন্তু সবজি পেলাম না। তুর্কি পোলাও-এর সাথে তুর্কি কাবাব, মুরগির রীতির তুর্কি রোস্ট দিয়ে খেলাম। রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার, শেফ তুর্কি নাগরিক। খাবারের রন্ধনপ্রণালি আসল তুর্কি রীতিতেই তা বিশ্বাস করা যেতে পারে।

তবে সত্যি বলতে কী খাবারগুলো সুস্বাদুই বটে। বেরুনোর সময় রেস্টুরেন্টের মুখে দুই মেয়ে শিশুকে দেখলাম কায়দা করে টাকা রোজগার করছে। দুজনই থাই ফর্সা। দুজনই জিনসের প্যান্ট ও ফ্রক পরেছে। একজনের বয়স বার-তের, অপরজনের বোধ হয় সাত-আট। দুজনই ভায়োলিন বাজাচ্ছে। অপূর্ব সুরের মূর্ছনা। ওদের পায়ের কাছে একটা গোলাকার হ্যাট- মেয়েশিশুরা যেগুলো পরে। সেখানে বেশ কিছু থাই বাথ জমা হয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ মুগ্ধ হয়েই ভায়োলিনে তোলা সুরের মূর্ছনায় অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। সালাহউদ্দিনের ডাকে সম্বিত ফিরে পেলাম। ‘ভাই আপনার না শরীর খারাপ?’

‘হাঁ, চলেন যাই।’ পকেট হাতড়ে পাঁচ বাথ পেলাম। হ্যাটের মধ্যে দিয়ে হোটেল অভিমুখে রওনা দিলাম। আমার হৃদয়ে তখনও ভায়োলিনে তোলা সুরের মূর্ছনা।

ফিরতে ফিরতে আগামী দিনের পরিকল্পনা সেরে ফেললাম। ব্যংকক এয়ারের ফ্লাইট রাত দশটায়। সুতরাং দুপুরের খাবার খেয়েই রওয়ানা দেব। দুটো সাইট নিয়ে আলোচনা হলো। পাতাইয়া ‘বোটানিক্যাল গার্ডেন’ ও ‘আন্ডার ওয়াটার ওয়ার্ল্ড’। পাতাইয়া বোটানিক্যাল গার্ডেন নাকি এশিয়ার অন্যতম সেরা উদ্যান। ২.৪ বর্গকিলোমিটার এলাকা নিয়ে গড়ে ওঠা এই উদ্যানে ৬৭০ প্রজাতির কয়েক হাজার বৃক্ষ রয়েছে। বৃক্ষ উদ্যান ছাড়াও রয়েছে পুষ্প উদ্যান, পাথর উদ্যান (রক গার্ডেন), কৃত্রিম হ্রদ, ঝরনা ইত্যাদি। রয়েছে বাই-সাইকেল। ভাড়া নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখা যেতে পারে।

আর আন্ডার ওয়াটার ওয়ার্ল্ড মাটির নিচে মাছের অ্যাকুইরিয়াম। দুটোরই প্রবেশ মূল্য প্রায় সমান পাঁচ শ বাথ (তের শ ত্রিশ টাকা)। প্রবেশমূল্যের কথা চিন্তা করে পদযুগল ঠাণ্ডা হয়ে এল।

হোটলে চলে এসেছি। অভ্যর্থনা ডেস্কে বসা তরুণীকে হ্যালো বলতেই হাসিমুখে কালকের পরিকল্পনা জানতে চাইলো। আমরা উভয়েই তখন বাকরুদ্ধ। কী বলব? অবশেষে বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে আমিই মুখ খুললাম। আমাদের ইচ্ছে একইসাথে ম্যানিব্যাগের করণ অবস্থা দুটোই বললাম। সাথে এও বললাম আমাদের দেশের মানুষের জন্য এটা বিলাসিতাই বটে। তরুণী বেশ সহৃদয়। আমাদের বসতে বলে দু'জায়গায় ফোন করল। থাই ভাষাতে বাতচিং করছে। বুঝলাম না।

সহৃদয় তরুণী জানাল একটা টুরিস্ট পার্টির সাথে আমরা আন্ডার ওয়াটার ওয়ার্ল্ড দেখতে যেতে পারি। ওদের বাস হোটেল থেকে আমাদের নিয়ে যাবে, দিয়েও যাবে। প্রবেশমূল্য দিতে হবে তিন শ বাথ (সাত শ নব্বই টাকা) সাথে সাথে রাজি হয়ে গেলাম, প্লেন যেহেতু রাতে, সুতরাং ট্যাক্সিতে করে ব্যাংকক না গিয়ে বাসে যাব। তাতে করে খরচের পাশ্চাত্য থেকে ছোটো একটি বাটখারা হলেও নেমে পড়বে।

ক্ষণকাল পরেই তরুণী গোল বাধাল।

‘তোমাদের তো আসতে আসতে একটা দুটো হয়ে যাবে। কিন্তু চেকআউট টাইম বারটা’।

বললাম, ‘আমাদের কক্ষটি কি ইতোমধ্যে বুকড?’

‘সেটা হতে কতক্ষণ? সকালে তোমরা যখন বাইরে থাকবে তখন যদি কেউ এসে পড়ে?’ মহা ঝামেলা!

‘আমাদের দুজনের দুটো মাত্র ব্যাগ। ব্যাগে মূল্যবান কিছু নেই। এখানে রেখে যাব, তাহলে কি চলবে?’

‘না, ব্যাগের দায়িত্ব আমরা নেব না।’

আমি প্রায় আতর্নাদই করে উঠলাম। বললাম, ‘দেখ নেপালে র্যাডিসনে আমরা অন্তত দশজন ব্যাগ রেখে ঘুরতে গিয়েছি। তারা তো এমন করেনি।’ চিড়ে বোধহয় ভিজল!

উনি সমাধান দিলেন; তা হচ্ছে, আমরা আমাদের ব্যাগ গুছিয়ে ব্যাগে তালা মেরে ঘরেই রেখে যাব। ঘরের দরজার চাবি অভ্যর্থনা ডেস্কে রেখে যাব। কেউ আসলে তাকে তুলে দেয়া হবে আর না আসলে তো ল্যাঠা মিটেই গেল।

বলাই বাহুল্য, সে রাতে ঘুম হয়েছিল প্রশান্তিময়। ক্লান্ত শরীরে বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই দু’চোখ জুড়ে রাজ্যের ঘুম স্বপ্নের দেশে তুলে নেয়।

পরদিন সকাল সোয়া ন’টায় গাড়ি এল। নতুন জাপানি সিভিলিয়ান মিনিবাস। আমরা দুজন বাদে আর সকলেই শ্বেতাঙ্গ নারী-পুরুষ। শেষের যাত্রী হিসেবে পেছনের সারিতে জায়গা পেলাম। মিনিট বিশেকের ব্যবধানে পৌঁছে গেলাম সুকুমভিট সড়কে আন্ডার ওয়াটার ওয়ার্ল্ডে।

সিঁড়ি বেয়ে ভূগর্ভস্থ আন্ডার ওয়াটার ওয়ার্ল্ডের প্রবেশপথে পৌঁছলাম। হালকা তল্লাশি, খুব বড়ো কোনো ইস্যু নয়। সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়াতে নাকি আন্ডার ওয়াটার ওয়ার্ল্ড অনেক বড়ো। এটি মাত্র একশ’ মিটার দীর্ঘ অর্ধচন্দ্রাকৃতির সুড়ঙ্গ। মাথার ওপরে দুপাশে মোটা হালকা নীল কাঁচের আবরণী। এখানে সাতশ’ পঞ্চাশ প্রজাতির মাছ রয়েছে। পানিতে শুধু মাছ নয় জলজ্যান্ত মানব পিঠে ও পায়ে অক্সিজেন সিলিন্ডার লাগিয়ে পানির ভেতরে সাঁতরে বেড়াচ্ছে। পৃথক মূল্য প্রদানসাপেক্ষে অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মানুষকুল সাঁতরে বেড়াচ্ছেন। মুখ দিয়ে বুদবুদ ছাড়ছেন।

এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত ধীরে ধীরে হাঁটলাম। মাছ যে কত বর্ণের ও কত আকৃতির হতে পারে তা এখানে না এলে জানা হতো না। আল্লাহর দেয়া নয়ন জুড়িয়ে গেল। ছোটো, মাঝারি, বড়ো কত আকৃতির মাছ! লাল-নীল-সবুজ-পীত-

কমলা-হলদে কত বর্ণের মাছ! লম্বা গোলাকার ডিম্বাকৃতির
কত ধরনের মাছ! শুঁড়ওয়ালা-করাতের ন্যায় দাঁতওয়ালা কত
না বিচিত্র মাছ!

ঘণ্টাখানেক ঘুরে হৃদয়-মনে প্রশান্তি নেমে এল। প্রাণিজগতে
আমি সবসময়ই আনন্দ অনুভব করি। চিড়িয়াখানায় সুযোগ
পেলেই যাই। কেন যেন ভালো লাগে। কেন ভালো লাগে,
জানি না। সুযোগ পেলে কোনো কোনো মনোবিজ্ঞানীকে
জিগেস করার পণ করলাম, কেন আমি প্রাণিজগতে আনন্দ
অনুভব করি?

আমাদের সময়ের অভাব। অন্য পর্যটকরা যখন আন্ডার
ওয়াটার ওয়ার্ল্ড সময় কাটাচ্ছে, আমরা তখন বেরিয়ে এসে

সামনেই ভারতীয় এক ফাস্টফুডের দোকানে ঢুকে
উদরপূর্তিতে মেতে উঠলাম। দোসা, ইডলি, দই বড়া, সাথে
পাঁপড় তো আছেই।

হোটোলে পৌঁছলাম দুপুর একটায়। না, আমাদের কক্ষে নতুন
কোনো অতিথি আসেনি। আমাদের ব্যাগ অক্ষত রয়েছে।
লাগেজ নিয়ে টুকটুকে করে বাসস্ট্যান্ড পানে ছুটলাম, যদিও
হাতে ঢের সময়। পেছনে রইল পাতাইয়া নগরীতে দু'দিন
ঘোরাঘুরির স্মৃতি। আর কোনো দিন আসার সুযোগ হবে
কিনা, প্রয়োজন পড়বে কিনা জানি না। সুযোগ যদি আবার
হয়-ই তাহলে ফুকেট বা চিয়াংমাইয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব।

সমাপ্ত

আমাদের শিক্ষার নৈতিক দীনতা ও একজন ডায়াজিনিস

জাহিদুর রহিম

অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক যখন ছাত্র হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন, তখন এই প্রতিষ্ঠানের সবে শৈশব। এর পরে এখানেই তাঁর পেশাজীবন শুরু ও শেষ। আমৃত্যু প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন শিক্ষা আর অধ্যাপনার কাজে। দুটি হারিয়ে যাওয়া অনুবাদ, একটি অসমাপ্ত বই, কিছু চিঠি, দুটি বক্তৃতা, আর সুপারিশনামা- এর বাইরে তাঁর লিখিত উপস্থিতি কোথাও পাওয়া যায় না। দেখতে এমন দেবপ্রতিম ছিলেন না যে তাঁকে দেখামাত্র মানুষ তাঁর ভক্ত হয়ে উঠবে, ছিলেন না ভালো বক্তা যে শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে শুনবে তাঁর কথা। কখনো গ্রহণ করেননি বা প্রত্যাশা করেননি আলোকিত কোনো আসন, অথচ ত্রিকালের (ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ) জ্ঞানসাধনার ইতিহাসে এখনো অধ্যাপক রাজ্জাক প্রাসঙ্গিক ও কিংবদন্তি।

অসমাপ্ত পিএইচ.ডি.র গবেষণা সুপারভাইজর প্রফেসর হ্যারল্ড লাক্সির বিশেষত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাজ্জাক স্যার যে-কথা বলেছিলেন সেটা তাঁর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, ‘মি. লাক্সি অন্য মানুষদের এমন সব বিষয়ে চিন্তা করতে প্ররোচিত করতে পারতেন নরমালি তারা যেটাতে অভ্যস্ত না।’

দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতানির্মাণে, নিষ্কাম জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে প্রচলিত জনমত উপেক্ষা করে নিজের বিশ্বাসের প্রতি স্থির থেকেছেন আজীবন। প্রাচীন ঋষিদের মতো তিনি সমগ্র জীবন ব্যয় করেছেন জ্ঞান আহরণে আর অবলীলায় অগ্রাহ্য করে গেছেন পার্থিব সাফল্য। এই ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলে আর কোনো জীবিত বা মৃত মানুষ এদেশের জ্ঞানজগতে এতো আলোচিত আর প্রভাবশালী ছায়াদানকারী হিসেবে থাকেননি। তিনি

অর্জন করেছেন মহত্ব, অর্জনে আর ত্যাগে হয়ে উঠেছেন অসাধারণ।

রাজ্জাক স্যার বেশিরভাগ কথাই বলতেন খুব সরল সাধারণ করে; কিন্তু এর মাঝে ঠিকই ধরা পড়ত তাঁর ঐকান্তিক উপলব্ধি। অধ্যাপক রাজ্জাক ছাত্র ও শিক্ষক হিসেবে প্রায় পাঁচ দশক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন। খুব কাছ থেকে দেখেছেন এদেশের শিক্ষার কাঠামোবিন্যাস, স্থিতি, উচাটন, দুর্বলতা, সামর্থ্য ও বাহুল্য। সারাজীবন সংস্পর্শে এসেছেন দেশি-বিদেশি নানা গুণী ও পণ্ডিতজনের। তাঁদের উপস্থিতি আর কার্যক্রম গবেষক হিসেবে, শিক্ষক হিসেবে, শিক্ষাবিদ হিসেবে দেখেছেন। দুর্ভাগ্য হলো, শিক্ষা নিয়েও রাজ্জাক স্যারের কোনো লিখিত বক্তব্য পাই না আমরা। তবে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে খুব স্বাভাবিকভাবেই এদেশের শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের অবস্থান সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন নিরাভরণ রূপে।

২

এই উপমহাদেশের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা আর তার বিস্তারের অসামঞ্জস্য অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক বহুবার তাঁর অনুগামীদের বলেছেন। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা ও প্রভাব অনস্বীকার্য, আর তা হতে হবে ধারাবাহিক। উচ্চশিক্ষার প্রতি যোগসূত্রহীন উন্মাদনা যেখানে শুধু ডিগ্রি বা সার্টিফিকেটের মোহ তৈরি করতে পারে, জ্ঞানসৃষ্টি সেখানে অসম্ভব। এক স্মৃতিচারণায়

অধ্যাপক রাজ্জাক উল্লেখ করেছিলেন, কাজী মোতাহার হোসেন কবি নজরুল ইসলামকে বলেছিলেন, ‘মডার্ন এডুকেশন আর কিছু না, লাউয়ের মাচার মত জিনিস। মাচা না থাকলে লাউগাছ ত বাড়তে পারে না।’ নজরুল ইসলাম শুনে বলেছিলেন, ‘তোমার কথা ঠিক কাজী। তবে লাউগাছের চেয়ে মাচার ওজন এখানে বেশি।’ এর ব্যাখ্যায় রাজ্জাক স্যার বলছেন, ‘বেঙ্গলের এন্টায়ার এডুকেশন সিস্টেমটাই টপহেভি। এখানে সাপোর্টিং কলেজ তৈয়ার করণের আগে ১৮৫৭ ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি তৈয়ার অইছে। একইরকম সাপোর্টিং স্কুল ছাড়া কলেজগুলো তৈয়ার অইছে। তখন গ্রামেগঞ্জে যেখানে যাইবেন দেখবেন কলেজ অইতাছে। এইগুলো কোনো কামে আইব না। আমাগো দরকার শক্তিশালী মিডল স্কুল। শিক্ষার আসল জায়গাটাই নজর পড়তেছে না কারো, হের লাইগ্যা এইখানে ডিগ্রীর লাইগ্যা মানুষের একটা ক্রেজ জন্মাইছে। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির বাইরে ইন্ডিয়ার অন্য কোন অঞ্চলে এই ক্রেজ পাইবেন না।’

রাজ্জাক স্যার পড়াশোনার খাতিরে বেশ কবছর ব্রিটেনে ছিলেন। সেই আলোকে স্কুল এডুকেশন প্রসঙ্গে আরো একটি কথা বলেন, ‘গ্রেট ব্রিটেনের বাজেটে ডিফেন্সের চাইতে এডুকেশনে বেশি অর্থ অ্যালট করা হয়। এখন দেখতে পারবেন, এভারেজ ইংলিশ চিলড্রেনের স্কুলে বাধ্যতামূলকভাবে এক পাউন্ড দুধ খাইতে অয়। হের লাইগ্যা এভারেজ ইংলিশ চিলড্রেনের হেলথ মাচ বেটার দ্যান ওয়াজ ইন দ্যা টাইম অব এম্পায়ার।’ প্রসঙ্গটি বর্তমান বাস্তবতায় বাংলাদেশে যেন আরো বেশি জীবন্ত। এখানে সবচেয়ে অবহেলিত প্রাথমিক আর মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষার সঙ্গে পুষ্টির সম্পর্ক যে প্রশ্নাতীত – সেই বুঝ এদেশের নীতিনির্ধারকদের কাছে এখনো অনুপস্থিত। এদেশে এখনো

সামরিক ব্যয়ের চেয়ে শিক্ষার বরাদ্দ চোখে পড়ার মতো কম।

রাজ্জাক স্যার তাঁর সময়ের শিক্ষকদের পাণ্ডিত্য নিয়ে যতটা না উচ্চকিত ছিলেন তার চেয়ে বেশি ছিলেন সেই সময়ের শিক্ষকদের নৈতিকতার প্রশ্নে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ব্যক্তি সাধনায় বিকশিত হয়; কিন্তু সমাজের মধ্যে জ্ঞানের প্রয়োজন অনুভূত হওয়া চাই। বৃহত্তর অর্থে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনাও সমাজ-প্রক্রিয়ার একটি অংশ। সমাজের মানুষের চিন্তার ও নৈতিকতার ছাপ পড়ে শিক্ষকমানসে। তারপরে তা বর্তায় ছাত্রদের ওপরেও। জাগতিক প্রলোভনের হাতছানিকে যিনি সহজতায় অগ্রাহ্য করতে পারেন, শিক্ষক অভিধা তাঁকেই মানায়।

রাজ্জাক স্যারের এম.এ. পরীক্ষা ডিউ ছিল ১৯৩৫-এ। দিয়েছিলেন পরের বছর। এর কারণ উল্লেখ করে বলেছিলেন, ‘আমি বললাম বাবাকে, যদি ভাইভা দিতে কন দিতে পারি। কিন্তু সেকেন্ড ক্লাস পাব। কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সামনের বছর ভাইভা দিলে ফার্স্ট ক্লাস পাইতে পারি। আর তারপর ইউনিভার্সিটিতে চাকরি পাইলে ২০০ টাকার বেশি মায়না হইব না। সংসারে এর বেশি তাইলে তো আমি সাহায্য করতে পারুম না। এখন আপনি যা বলেন।’

রাজ্জাক স্যার খুব গর্বের সঙ্গে সেইসব শিক্ষককে স্মরণ করেছেন, আজীবন যাঁরা চারপাশের জাগতিক লোভের হাতছানি উপেক্ষা করেছেন। যেমন : এক আলোচনায় স্যার উল্লেখ করেছেন অর্থনীতির অধ্যাপক অমিয় দাশগুপ্তের প্রসঙ্গ – যিনি পরবর্তীকালে ভারতে বেনারস হয়ে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন। তিনি ১৯৪০ সালে বেঙ্গল গভর্নমেন্টের সেক্রেটারি অব অ্যাগ্রিকালচার পদ ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস টু লেকচারার হয়েছিলেন। এটা অন্তর্গত ভালোবাসা আর নৈতিকতার সুউচ্চ বোধ ছাড়া অনুভব করা

সম্ভব নয়। অধ্যাপক রাজ্জাকের মতে, ‘বাইরে অন্য চাকরির আকর্ষণ তো কম ছিল না। তখন আমাদের ক্লাস টু মাস্টারের সর্বোচ্চ মাইনে ২০০ টাকা। আর একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পেত সাতশ-আটশ টাকা। এরা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হতে পারতেন। কিন্তু সেই প্রপেনসিটিটা ছিল না।’ অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত ছিলেন ২০০ টাকা বেতনের ক্লাস টু লেকচারার। এই সব শিক্ষক পার্থিব লোভের ওপরে উঠে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নৈতিক মানদণ্ড।

৩

রাজ্জাক স্যার যে-বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হিসেবে ভর্তি হন সে-বছরই ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। কিন্তু হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মাঝে সেই সংঘাত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক সম্পর্কে কোনো প্রভাব ফেলত না। জ্ঞানচর্চা ও তার মূল্যায়নে শিক্ষক সমাজ ছিলেন সংকীর্ণতার উর্ধ্ব। রাজ্জাক স্যারের ভাষ্যমতে, ‘ইউনিভার্সিটির মধ্যে হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের দাঙ্গা হতো না, ছাত্র শিক্ষকদের মধ্যে এর প্রভাব দেখিনি। হিন্দু শিক্ষকদের সংখ্যাই ছিল বেশি। কিন্তু তারা যে সাম্প্রদায়িকভাবে মুসলমান ছাত্রদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে ভিকটিম করবে তা ছিল না। এমন কোন রেকর্ড নেই। মুসলমান ছেলে বলে যে ফাস্ট ক্লাসের যোগ্য হলেও সেকেন্ড ক্লাস দেবে, টু মাই নলেজ, এমন দৃষ্টান্ত আমি দেখি না। এটা তারা করতো না। একদম না। মুসলমান ছাত্রদের যে অসুবিধা ছিল সেটা হচ্ছে এই যে, হিন্দু ভাল ছাত্রদের সঙ্গে তাদের শিক্ষকদের যে সামাজিক সম্পর্ক ছিল, মুসলমান ছেলেদের সেটা ছিল না। শিক্ষক বেশিরভাগ হিন্দু ছিল। হিন্দু ছেলেদের বেশিভাগেরই এদের সঙ্গে সামাজিক এবং আত্মীয়গত একটা পরিচয় ছিল; কেউ আত্মীয়, কেউবা আত্মীয়ের বন্ধু। এই সূত্রে শিক্ষকদের

বাড়িতে এই ছাত্রদের একটা স্বাভাবিক যাতায়াতও ছিল। এ ক্ষেত্রে মুসলিম স্টুডেন্টস ওয়েরার কমপ্লিটলি আউট। আর্থিক শ্রেণিগত পার্থক্যটাও কম নয়। যে শ্রেণি থেকে হিন্দু শিক্ষক হতো, সে ক্লাসের ছাত্র তো মুসলিম নয়। তবে মুসলিম ছেলে ভালো করলে হিন্দু শিক্ষক অবশ্যই খুশি হতেন। তার কৃতিত্ব স্বীকার করতেন। হরিদাস বাবু, মানে হরিদাস ভট্টাচার্য দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। তার কমিউনাল বলে পরিচয় ছিল। টিকিধারী ব্রাহ্মণ। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে, ছাত্রদের বিদ্যার বিচারে কখনো তিনি কমিউনাল হননি।’ এখন হয়তো এই দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় না। কিন্তু সংকীর্ণ দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ছাত্রদের প্রতি অনুরাগ বা বিরাগের উপস্থিতি এদেশের শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে। শুধু তাই নয়, সামান্য ‘গ্রেড উন্নতি’ বা ‘প্র্যাকটিক্যাল মার্কস’কে জিম্মি করে ছাত্রদের কাছ থেকে অর্থ আদায়, এমনকি অনৈতিক সুবিধা আদায়ের প্রচেষ্টা (বিশেষত ছাত্রীদের ক্ষেত্রে) এদেশে আকছার দেখা যায়।

পরীক্ষা, এর মূল্যায়ন ও পুরো প্রক্রিয়া ছিল শিক্ষকদের কাছে খুব পবিত্র এক বিষয়। এ-বিষয়ে শিক্ষকদের কোনো শৈথিল্য বা উদাসীনতা তখন ছিল অকল্পনীয়। স্যারের মতে, ‘পরীক্ষার আইন ছিলো এদের কাছে অলঙ্ঘনীয়। পরীক্ষার ব্যাপারটা ছিল সিকরেড। এই বোধ তাদের রক্তমাংসে ছিল। কিন্তু সেই সিরিয়াসনেস তো আজকাল একেবারে উঠে গেছে।’ তাঁর নিজের সমকালের শিক্ষকদের নৈতিকতার বিষয়ে অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের উচ্চ ধারণা ছিল। এর অর্থ এই নয় যে, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মানে বা যোগ্যতায় তিনি খাটো করে দেখছেন। বরং তুলনামূলক ভাষ্যে বর্তমান শিক্ষকদের অ্যাকাডেমিক গড় যোগ্যতা সেকালের শিক্ষকদের চেয়ে তিনি এগিয়েই রাখছেন। তাঁর মতে, ‘ভালোর ক্ষেত্রে আমি যদি বর্তমানকে সেদিনের সঙ্গে তুলনা করি, তাহলে আমি মনে করি না যে, বর্তমান আগের

চেয়ে খারাপ। এভারেজ অফ দি ফ্যাকাল্টি ইজ হাইয়ার নাউ। খুব ভালো শিক্ষক তখন দু'একজন নামকরা ছিলেন। প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টেই। তবে এভাবেই এখন অনেক হাইয়ার, সেটা এই সেন্সে যে, পিএইচ.ডি করা শিক্ষক তখন সংখ্যায় কম ছিলেন। ডিপার্টমেন্টে দু'একজন করে। আর এখন, ইউ উইল হ্যাভ হোল ডিপার্টমেন্ট যেখানে সকলেই পিএইচ.ডি এটা তখন ছিল না।'

৪

ঠিক এভাবে স্যার ভাবতেন এখনকার ছাত্রদের ক্ষেত্রেও। কিন্তু যে-জায়গায় তিনি ঘাটতি পেতেন তা হলো টেক্সটবুক পড়া ও লাইব্রেরি ব্যবহার করা এবং দায়িত্ববোধের ক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রে আবার পুরনো কথাই বলতে হয়, বৃহত্তর সমাজের নৈতিকতার শৃঙ্খলহীনতা ও শিক্ষাকে সামাজিক স্বার্থে ব্যবহারের হীন বোধ – সবটা দ্বারাই এই শিক্ষক ও ছাত্র সমাজ প্রভাবিত। অধ্যাপক রাজ্জাক বলছেন, 'একেবারেই কিছু করা যাচ্ছে না এবং কামনে হবে, আই ডু নট নো, যে ঐ সেন্স ও রেসপনসিবিলিটি নেই। ঐ যে একটা সেন্স অব সেম সেকালে দেখেছি ফর নট হ্যাভিং টেকেন এ ক্লাস, নট হ্যাভিং ডান এনি ডিউটি; দিস সিমস টু হ্যাভ ভ্যানিসড। বাট দিস ইজ নট পিকুলিয়র টু দি ইউনিভার্সিটি। এটা তো কেবল ইউনিভার্সিটির বৈশিষ্ট্য নয়। এই যে লুজেনিং অব বাউন্ডস, শৃঙ্খল মুক্তির স্বাধীনতা, শিকল বলেন, বন্ধন বলেন, তার থেকে মুক্তির ভাব; দিস কামস ফাস্ট ইন দি সোসাইটি এট লার্জ।' যদিও আমরা আশা করছি যে, যেহেতু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেখানে শিক্ষার চর্চা চলে, সুতরাং সেখানকার পরিবেশে উচ্চমাত্রার নৈতিকতা থাকবে, থাকবে একাগ্র ও সংযুক্ত যোগাযোগ কৌশল। রাজ্জাক স্যারের অভিমত হলো, 'এমন চাওয়াটাও বাস্তবসম্মত নয়। যেখানে উচ্চশিক্ষার আগের পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা ভালো নয়। 'দি

ইউনিভার্সিটি উইল মিয়ালি শো ইন মোর মার্কড ফর্ম সেইম কাইন্ড অব ভ্যালু হুইচ উইলস ইন দি সোসাইটি। এটা নিকট ভবিষ্যতে যাবে না। আমার ধারণা সেকেন্ডারি স্কুলিং ভালো না হলে এটা হবে না। সেকেন্ডারি স্কুলিং ভালো হতে বহু সময় লাগবে। ইন দি মিনহোয়াইল যা হবার হবে।' প্রশ্নপত্র ফাঁস, নৈতিক স্থলন যেখানে খুব ব্যতিক্রম কোনো ঘটনা নয়, সেখানে সে-যুগের পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা আর শিক্ষার বিষয়ে শিক্ষকদের নৈতিক দায়িত্ববোধ (কমিটমেন্ট) এখন বিস্ময়কর। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক শিক্ষকের স্ব-বিভাগে শিক্ষাদান সেকেন্ডারি ওয়ার্কে পরিণত হয়েছে। কনসালটেন্সি করতে গিয়ে তাঁর প্রাথমিক দায়িত্বে অবহেলা শিক্ষকদের মধ্যে কোনোরূপ পাপবোধ সৃষ্টি করে না এখন। আর এটাই সবচেয়ে ভয়ের কারণ।

এর অর্থ এই নয় যে, আগের দিনের সবকিছু কুসুমাস্তীর্ণ ছিল। বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পদপ্রাপ্তি ও অন্তর্কলহ যেন চিরকালীনতা লাভ করেছে। এ-বিষয়ে রাজ্জাক স্যারের সরল স্বীকারোক্তি, 'এক্ষেত্রে মোড অব অপারেশন আজকালকার থেকে খুব যে ডিফারেন্ট ছিলো এমন নয়। বিষয়বস্তু একই, তবে অপারেশনটা একটু মোর সাবটল ছিল তিনি আরো বলছেন, 'আগের দিনে ঝগড়াঝাটি ইউনিভার্সিটিতে ছিলো না, তা নয়। তবে দেখা যায় পয়সা-কড়ির প্রতি আসক্তিটা একটু কম ছিলো, অন্যদের তুলনায়। ফলে অন্যরা এদের কাছে একটু বিব্রত, একটু অকওয়াড ফিল করতো।'

এই পয়সা-কড়ির প্রতি আসক্তি বা চাহিদা বৃদ্ধির পেছনে রাজ্জাক স্যার খুব তাৎপর্যপূর্ণ এক অভিমত দিয়েছেন। স্যার মনে করেন যে, 'বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ছয়-সাত দশকে ধীরে ধীরে মুসলমান শিক্ষকদের সংখ্যা স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এই বিকাশমান মুসলিম মধ্যবিত্ত তাদের ফেলে আসা সামাজিক ক্লাসের আত্মীয়দের সাথে বিচ্ছিন্ন

হতে পারে না। শুধু তাই নয়, এই ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় নিজের আত্মীয়তাভুক্ত সম্প্রদায়কে আপন উত্তরীত ক্লাসে অংশগ্রহণের নিমিত্তে নিজেকে দায়িত্ব নিতে হয়। এই দায়িত্ব আর দরকার পুরাতন সময়ের শিক্ষক বিশেষত হিন্দু মধ্যবিত্ত শিক্ষকদের অধিকাংশের জন্য ছিলো না।’

৫

অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক শুধু উচ্চশিক্ষার বিরাজমান অব্যবস্থাপনা নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, উপাচার্য নিয়োগ, বিভিন্ন শ্রেণির সংখ্যাভারী কর্মচারীদের কাজ, সংখ্যার র্যাশনালাইজেশন বা যুক্তিসংগত বিন্যাসের সমস্যার কথা বিভিন্ন আলাপে প্রকাশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের নথির পেছনে বিপুল অর্থ ও বেশিরভাগ সময় নষ্টকে অপ্রয়োজনীয় দেখছেন এই প্রবীণ অধ্যাপক। তাঁর মতে – ‘এই এন্টায়ার, এক্সারসাইজ ইজ আননেসেসারী। আমাদের ৫০০-৬০০ কেরানী। এদের ছাত্রদের সঙ্গে কনট্যাক্টটা কি দেখুন : ছাত্রদের তারিখ মতো মায়না দিতে হবে, তারিখ মতো মায়না না দিলে জরিমানা দিতে হবে, তারিখ নির্ধারণ, তারিখ বর্ধন, নাম কাটন, নাম তোলা, এ্যাডমিশন, রি-এ্যাডমিশন ইত্যাদি, ইত্যাদি এর জন্য এই বিপুল ব্যবস্থা। এই রেজিস্টার স্কলারশিপ দেন, স্কলারশিপ নিতে হলে অমুক তারিখে আসতে হবে, না হলে অমুক হবে, তমুক হবে, ইত্যাদি। এর কোনটারই দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। এগুলো তো বুক ট্রেনসাকশন, খাতা লেখা, ছাত্রদের মাইনে নেওয়া, সিটরেন্ট আদায় করা ইত্যাদি। এর প্রত্যেকের জন্য আপনি স্টাফ রাখছেন, কর্মচারী লাগাচ্ছেন।’ শুধু তাই নয়, রাজ্জাক স্যার বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপেয়ার খাতে নিয়োজিত যে-ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ আছে তার ন্যায্যতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। এই বিভাগের পেছনে যত টাকা বাৎসরিক ব্যয় হয়, তত টাকার

নির্মাণ তো প্রতিবছর হয় না। অথচ এই বিভাগে শত শত কর্মচারী। এছাড়া কর্মচারীদের (বিশেষত চতুর্থ শ্রেণির) নিয়োগ ও শিক্ষকদের সঙ্গে তাদের বেতনের অনুপাতে চরম বৈষম্যের উল্লেখ করেন।

রাজ্জাক স্যার বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের বিষয়ে যেসব কথা বলেছেন প্রতিটিই যুক্তিসংগত এবং এর সমাধানে যেসকল খুব সরল স্বাভাবিক প্রক্রিয়া উল্লেখ করেছেন সেগুলো বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের উচ্চশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত করা হয়। তিনি যে-সময়ের উল্লেখ করেছেন, তার তুলনায় বর্তমানে কর্মচারীর সংখ্যা নিশ্চয় আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। সেইসঙ্গে বেড়েছে আনুপাতিক হারে অ্যাডমিনিস্ট্রিটিভ ব্যয় (রাজ্জাক স্যার তাঁর সময়ে মোট বাজেটের প্রায় ২০-২৫ অ্যাডমিনিস্ট্রিটিভ ব্যয়ের কথা উল্লেখ করেছিলেন, যেখানে উন্নত বিশ্বে এই অ্যাডমিনিস্ট্রিটিভ ব্যয় কথাটাই অপরিচিত)। কিন্তু স্যারের যুক্তিসংগত মতামত যে এই দেশে অনুসারিত হবে না এর কারণ আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিন্যাসের এবং বিকাশের ধরনটাই অযৌক্তিক আর অসংগতিতে ভরা। এ-কারণে শিক্ষা-গবেষণায় বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থান পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর তুলনাতেও অকিঞ্চিৎকর এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত রাজধানী ঢাকার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আয়তন আর কাঠামোগতভাবে যে-উন্নতি, জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে তার ভয়ানক দুর্বলতার চিত্র চোখে পড়ার মতো। আহমদ হুফা লিখছেন, ‘জ্ঞান চর্চার সামাজিক প্রেক্ষিতটির কথা অবশ্যই ধর্তব্যের মধ্যে আনতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলা হয়ে থাকে। কেন এই তুলনাটা করা হয় তার হেতু অদ্যাবধি আমি আবিষ্কার করতে পারিনি। ঘর, বাড়ি, অট্টালিকা এসকল ভৌত কাঠামোগত কারণে যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অক্সফোর্ডের সাথে তুলনা করা হয়, আমার বলার কিছু থাকে না ...।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন, যারা জ্ঞানচর্চার নানা ক্ষেত্রে পথিকৃতির ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তারা ছিলেন ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোডাক্ট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে সকল ছাত্র পাশ করেছেন তারা জ্ঞানচর্চার কোন ক্ষেত্রটিতে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন সেই জিনিসটি নতুন করে যাচিয়ে দেখা প্রয়োজন। উনিশশো একুশ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়েছে। উনিশশো একুশ থেকে সাতচল্লিশ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রও আইসিএস পাশ করেনি। একথা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বলার উপায় নেই।’

৬

অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক বিভিন্ন আলাপে জানিয়েছিলেন, তাঁর শিক্ষকজীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি আর সবচেয়ে বড় পুরস্কার কী। ‘আমরা শিক্ষকেরা প্রতিবছরই বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু প্রতিটি নতুন বছরে আমাদের কাছে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা এসে হাজির হয়। এই তরুণদের চাহিদা, চাওয়া-পাওয়ার খবর আমাদের মতো লোলচর্ম বৃদ্ধদের জানার কথা নয়, এটাই হল শিক্ষা জীবনের সবচাইতে বড় ট্রাজেডি’ - অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের অভিমত।

আর পুরস্কার বলতে যে-বিষয়টি স্যার উল্লেখ করেন, তা অনুভবের জন্যও উচ্চ মানসিকতাসম্পন্ন বোধ প্রয়োজন। রাজ্জাক স্যার মনে করতেন, ‘শিক্ষক যা ছিলেন তাই থাকেন। যেখানে ছিলেন সেখানেই থাকেন। তাঁর ছাত্ররা তাকে ছাড়িয়ে যায়, তারা ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। তারপর জীবনের সড়কে অতর্কিতে যখন আপাতভাবে অপরিচিত কোনো বয়স্ক কিংবা যুবক, কোন মানী কিংবা গুণী শিক্ষকের সামনে এসে নতমস্তকে দাঁড়ায় আর ডাক দেয় স্যার

সম্বোধনে এবং বলে আপনি আমায় চিনতে পারলেন না স্যার? আমি আপনার ছাত্র ছিলাম। তখন শিক্ষক পুরস্কৃত বোধ করেন, নিজেকে ধন্য মনে করেন।’

গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডারের সময়ের স্বনামধন্য দার্শনিক ছিলেন ডায়োজিনিস। নগরের উপকণ্ঠে নীরবে-নিভূতে একাকী খুব সরল জীবন যাপন করতেন। না ছিল তাঁর পার্থিব জীবনের কোনো মোহ, না ছিল সম্রাট-উজিরদের প্রিয়ভাজন হওয়ার দূরতম প্রয়াস। একদিন রাজা-উজিরদের ঘনিষ্ঠ এক ধনী ব্যক্তি যাকে পরোক্ষভাবে সম্রাট পাঠিয়েছিলেন বলে জানা যায়, গেলেন ডায়োজিনিসের বাড়ি। গিয়ে দেখলেন এক দীর্ঘ কুটিরের সামনে জ্বলন্ত উনুনে বন থেকে কেটে আনা কাঠের সাহায্যে ডায়োজিনিস কিছু শাক সেদ্ধ করছেন। ধনী ব্যক্তিটি (আগন্তুক) খুব বিস্ময়ের সঙ্গে ডায়োজিনিসকে বলেন যে, ‘কেন আপনার মতো বড় পণ্ডিত মানুষ এত কষ্ট করবে! আপনি যদি সম্রাট-উজিরদের সঙ্গে একটু সুসম্পর্ক রাখতেন, তবে আজ ঐশ্বর্যশালী থাকতেন।’ একথা শুনে ডায়োজিনিস উত্তরে বলেছিলেন, ‘ঠিকই বলেছ। তবে তুমি যদি আমার মতো শাক সেদ্ধ খাওয়া শিখতে তবে সম্রাট আর উজিরদের তোষামোদী করে পরাধীন জীবন কাটাতে হতো না। নিজে স্বাধীন থাকতে।’

দিল্লি থেকে প্রকাশিত ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অব ইন্ডিয়া পত্রিকার প্রখ্যাত শিখ লেখক খুশবন্ত সিং অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাককে গ্রিক দার্শনিক ডায়োজিনিসের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। খুব ন্যায্যত আর যুক্তিসম্পন্ন এই তুলনা। ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের একজন। সারাজীবন খুব কম বেতনে পদোন্নতির কোনো আকাঙ্ক্ষা ছাড়াই বিদ্যাচর্চা করে গেছেন। জীবন চলার পথে সংস্পর্শে এসেছেন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সমাজের

নানা স্তরের মানুষের। তাঁর ছাত্ররাও দেশে-বিদেশে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আন্তর্জাতিক পর্যায়েও রাজ্জাক স্যারের পরিচিতি বা শুভানুধ্যায়ীদের সংখ্যা অপ্রতুল নয়। কিন্তু নিজ স্বার্থের কারণে কখনো কাউকে কোনো অনুরোধ করেছেন - এই নজির আমরা পাই না। তবে রাজ্জাক স্যারের কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন দেশি-বিদেশি এমন মানুষের সংখ্যা অগণন। সেই ঋণ কেবল বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, সামাজিক ও বাস্তবিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বরং আরো বেশি!

প্রকাশ্য আর গোপনে ছেড়েছেন ক্ষমতা আর প্রাচুর্যের সব প্রলোভন। সারাজীবনে যা জেনেছেন, উপলব্ধি করেছেন আর বিশ্বাস করেছেন, তা বলতে কখনো পিছপা হননি। নিজে আলোকিত হয়েছেন আর সেই আগুন থেকে জ্বলেছে মোমবাতির মতো আরো অসংখ্য তৃষিত প্রাণ। আহমদ ছফা যথার্থই লিখেছেন, ‘যে সময়ে, যে সমাজে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন, যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে তিনি বেড়ে

উঠেছেন, তার প্রভাব পুরোপুরি অতিক্রম করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তথাপি ভাবতে অবাক লাগে, তিনি যে প্রজন্মের মানুষ, সেই প্রজন্মকে কতদূর পেছনে ফেলে এসেছেন। পরবর্তী অনেকগুলো প্রজন্মকে বুদ্ধিবৃত্তি ও মানসকর্মণের দীক্ষা দিয়েছেন। বলতে গেলে কিছুই না লিখে শুধুমাত্র সাহচর্য, সংস্পর্শের মাধ্যমে কত কত আকর্ষিত তরুণচিত্তের মধ্যে প্রশংশীলতার অক্ষুর জাগিয়ে তুলেছেন, একথা যখন ভাবি বিস্ময়ে অভিভূত না হয়ে উপায় থাকে না।’

রাজ্জাক স্যার যে-দেশে যে-সময়ে জ্ঞানচর্চা করেছেন সেখানে মূর্খদেরই প্রাধান্য। কিন্তু নির্জনদের বলয় ছিন্ন করে জ্ঞানের প্রতি যেই নিষ্ঠা ও একাগ্রতা তিনি দেখিয়েছেন সেই বোধ তাঁকে দিয়েছে দেশ, সমাজ ও মানুষের প্রতি নিঃশর্ত অঙ্গীকারবোধের দীপ্তি। এমন দীপ্তিময় মানুষ বাঙালি মুসলমান সমাজে আর দেখা যায়নি।

দোহাই:

১. যদিও আমার গুরু : আহমদ ছফা, মাওলা ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮
২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ: অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের আলাপচারিতা : সরদার ফজলুল করিম, সাহিত্য প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩
৩. অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক স্মারকগ্রন্থ : প্রধান সম্পাদক আনিসুজ্জামান, বেঙ্গল পাবলিকেশনস, প্রথম প্রকাশ ২০১২

জাতীয় অধ্যাপক, জ্ঞানতাপস আব্দুর রাজ্জাকের ২১তম মৃত্যুবার্ষিকী, আগামী ২৮ নভেম্বর। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের লক্ষ্যে উক্ত প্রবন্ধটি *জ্ঞানতাপস আব্দুর রাজ্জাক স্মারকগ্রন্থ* (বেঙ্গল পাবলিকেশনস, চতুর্থ সংস্করণ, ২০১৯) থেকে লেখকের অনুমতিসাপেক্ষে পুনর্মুদ্রিত হলো।

এখন আর বঙ্গবন্ধুর চর্চা হয় না

আসিফ উল আলম ঐকত

আব্দুল্লাহ আবু সাইদের কাছে একবার একজন জিজ্ঞাসা করল, “নেতা কাকে বলে?” তিনি খুবই সরল ভাষায় অত্যন্ত গভীর উত্তরটিই দিলেন। তিনি বললেন, “যে ব্যক্তি ‘না’ বলতে পারে, সেই নেতা। সত্যের পক্ষে থেকে যে বিরোধীতা করতে পারে, সেই নেতা।” বঙ্গবন্ধু ১৮ বছর বয়সে সর্বপ্রথম জেলে গিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়েও বহুবার তিনি জেলে গিয়েছিলেন। আজকাল বঙ্গবন্ধুর গুণগ্রাহীদের ভাষ্যমতে, এই জেলে যাওয়াটা তাঁর ‘নেতা’ হওয়ার অন্যতম মূলমন্ত্র। তাঁরা দাবি করে বসে যে, প্রথম জেলে যাওয়াটাই তাঁর ‘নেতা’ হওয়ার পথে প্রথম কদম। প্রকৃতপক্ষে কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। কিন্তু এটিকেই একমাত্র কারণ বলে দাঁড় করানো একেবারে অনুচিত। জেলে গেলেই যদি নেতা হওয়ার হয়, তাহলে জেলে বসে বসে পকেটমারও নেতৃত্বের স্বপ্ন দেখবে। জেলে যাওয়াটা নয় বরং জেলে যাওয়ার কারণটাই ছিল তাঁর ‘নেতা’ হওয়ার প্রথম ঝলক। তবে, সত্যিকারার্থে তিনি তো সেদিনই ‘নেতা’ হওয়ার যোগ্যতা প্রমাণ করেছিলেন, যেদিন তিনি নিজ নেতার ভুল দেখে, নেতার মুখের সামনে প্রশস্ত বুকে বিরোধীতা করতে পেরেছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, “শহীদ (হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী) সাহেবের সাথে আমার কথা কাটাকাটি হয়। তিনি আনোয়ার সাহেবকে একটা পদ দিতে বলেন, আমি বললাম কখনোই হতে পারে না। সে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোটারি করেছে, ভাল কর্মীদের জায়গা দেয় না। কোনো হিসাব-নিকাশও কোনোদিন দাখিল করে

না। শহীদ সাহেব আমাকে হঠাৎ বলে বসলেন, “who are you? You are nobody.” আমি বললাম, “If I am nobody, then why you have invited me? You have no right to insult me. I will prove that I am somebody. Thank you, Sir. I will never come to you again.” এ কথা চিৎকার করতে করতে বৈঠক ছেড়ে বের হয়ে এলাম।”^১ কথাগুলো বলার সময়কালে বঙ্গবন্ধুর বয়স ছিল স্রেফ ২৪। অর্থাৎ, এটা তখনকার কথোপকথন, যখন বঙ্গবন্ধু মুসলিম লীগের একজন উঠতি নেতা আর শহীদ সোহরাওয়ার্দী মুসলিমলীগের প্রভাবশালী নেতা।

‘না’ বলার কাজটা যতটা সহজ মনে হয় আদতে ততটা সহজ নয়। তাও আবার নেতার সামনে রুদ্ধস্বরে কথা বলার উদাহরণ তো একেবারেই বিরল। এমন নয় যে, শেখ মুজিব অন্য কোন নেতার অনুসারী ছিলেন বলেই শহীদ সাহেবকে এভাবে কথা শুনিয়েছিলেন। বরং, শেখ মুজিব তাঁর আত্মজীবনীতে পরিষ্কারভাবেই লিখেছেন, “আমি ছিলাম শহীদ সাহেবের ভক্ত”। কিন্তু, ভক্তির মোহে তিনি কখনোই সত্যের পথকে ভুলে জাননি। ভক্ত হয়েও সর্বোচ্চ পর্যায়ে একজন নেতার ভুলকে অন্ধভাবে স্বীকার করেননি। “শহীদ সাহেব সহজ-সরল এবং উদার মনের মানুষ”, উক্তিটি বঙ্গবন্ধু তাঁর আত্মজীবনীতে বহুবার বলেছেন। এই সরলতার সুযোগ নিয়ে ১৯৪৪ সালের ইলেকশনে শহীদ সাহেবকে

বাদ দিয়ে খাজা নাজিমুদ্দীন ফজলুর রহমান সাহেবকে ইলেকশনের জন্য রেফার করে বসেন। আর এতেই ক্ষেপে উঠেন ছাত্র এবং লীগ কর্মীরা। নেতাদের মধ্যে বৈঠক হলেও, শেখ মুজিবসহ অনেকেই এর তীব্র বিরোধীতা করে বৈঠকে প্রবেশ করলেন এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে বললেন, “আপোস করার কোন অধিকার আপনার নাই। আমরা খাজাদের সাথে আপোস করবো না। কারণ, ১৯৪২ সালে নিজামুদ্দীন প্রধানমন্ত্রী হয়ে নিজের ভাইকে মন্ত্রী বানিয়েছিলেন। আবার তাঁর বংশের থেকে এগারজনকে ‘এমএলএ’ বানিয়েছিলেন। এদেশে তারা ছাড়া আর লোক ছিল না? মুসলিম লীগে কোটারি করতে আমরা দিব না। আমরাই হক সাহেবের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছি, দরকার হয় আপনাদের বিরুদ্ধেও আন্দোলন করবো।” সিদ্ধান্ত নেওয়া হল পরদিন সকালে জানানো হবে যে, খাজাদের সাথে আপোস হবে কি হবে না। পরদিনের ঘটনা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু বলছেন, “সকালে তিনি আমাদের নিয়ে বসলেন, আমি তাঁর কাছেই বসলাম। শহীদ সাহেব বললেন, ‘বুঝতে পারছি না তোমরা পাঁচটা সিটই দখল করতে পারবে কি না?’ আমি বললাম, ‘স্যার, বিশ্বাস করেন আমরা নিশ্চয়ই জিতব, খোদার মর্জি থাকলে আমাদের পরাজিত হবার কোন কারণই নাই।’ আমি টেলিফোন তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বললাম, ‘বলে দেন খাজা সাহেবকে ইলেকশন হবে।’ সেবারের পাঁচটি আসনেই শহীদ সোহরাওয়ার্দীরা জয় লাভ করেন।”^২

সত্যের উপর অটল থেকে বিরোধিতা করার জন্য যে গোর্দা প্রয়োজন সেটা মুজিবের প্রশস্ত বুকে বিদ্যমান ছিল। তাই, নেতার সব কথায় ‘সহমত ভাই’ না বলে, দরাজ কণ্ঠে বিরোধিতাও করতে পেরেছিলেন। আর ঠিক এই কারণেই তিনি একজন সফল নেতা হতে পেরেছিলেন। যেভাবে

নজরুল বলেছিলেন, “ধূমকেতু’র এমন গুরু বা এমন বিধাতা কেউ নেই, যার খাতিরে সে সত্যকে অস্বীকার ক’রে কারুর মিথ্যা বা ভণ্ডামিকে প্রশয় দেবে। ‘ধূমকেতু’ সে-দাসত্ব হ’তে সম্পূর্ণ মুক্ত।”^৩ তরুণ মুজিব যেন, নজরুলের সেই ধূমকেতুর জ্বলন্ত উদাহরণ।

বঙ্গবন্ধু তাঁর আত্মজীবনীতে গান্ধী হতে জিন্নাহ, শেরে বাংলা হতে সোহরাওয়ার্দী, ভাসানী কারো সমালোচনাই বাদ রাখেননি। খুব প্রাজ্ঞল ভাষায় পরিষ্কারভাবে তিনি সবারই সমালোচনা করেছেন। করেছেন কারণ সবাই মানুষ ছিলেন। একজন মানুষের বর্ণাঢ্য জীবনে সমালোচনার কিছুই থাকবে না এমনটা হতে পারে না। সমালোচনার অর্থ যে, বিরোধীতা নয়, গালিগালাজ দেওয়া নয় বা কাউকে ভুল প্রমাণ করা নয়, তা বঙ্গবন্ধু খুব ভালোভাবেই জানতেন। জনাতেন বলেই তিনি শহীদ সাহেবের সমালোচনা করলেও, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে কখনোই ভুলেননি। এখানে, ১৯৫৪ সালে শেখ মুজিব জেল থেকে মুক্তি পেয়ে পরের দিন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে সাক্ষাত করতে ছুটে যাওয়ার ঘটনাটি উল্লেখ না করলেই নয়। বঙ্গবন্ধু লিখছেন, “ঢাকা থেকে করাচি রওয়ানা হয়ে গেলাম। আমি মনকে কিছুতেই সাঙুনা দিতে পারছি না। কারণ শহীদ সাহেব আইন মন্ত্রী হয়েছেন কেন? রাতে পৌঁছে আমি আর তাঁর সাথে দেখা করতে যাই নাই। দেখা হলে কি অবস্থা হয় বলা যায় না। আমি তাঁর সাথে বেয়াদবি করে বসতে পারি। পরের দিন সকাল নয়টায় আমি হোটেল মেট্রোপোলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। তিনি বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। আমাকে দেখে বললেন, ‘গত রাতে এসেছ শুনলাম, রাতেই দেখা করা উচিত ছিল।’ আমি বললাম, ‘ক্লান্ত ছিলাম, আর এসেই বা কি করব, আপনি তো এখন মোহাম্মদ আলী সাহেবের আইনমন্ত্রী।’ তিনি বললেন, ‘রাগ করেছ, বোধহয়।’ বললাম,

‘রাগ করব কেন স্যার, ভাবছি সারা জীবন আপনাকে নেতা মেনে ভুলই করেছি কি না?’^৪

সাহিত্যের ভাষায় বলতে গেলে শুদ্ধ চর্চার জন্য সমালোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হয় আজকের দিনে সমালোচক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, নেই বলাটাও একেবারেই অত্যাধিক হতে না। সমালোচকের অন্যতম প্রধান গুণাবলী সম্বন্ধে শ্রীশচন্দ্র দাশ বলেন, “সহৃদয়তা, রসবোধ এবং উদারতা সমালোচকের প্রধান গুণ।”^৫ আজ এই গুণাবলীসম্পন্ন মানুষ নেই বলেই সমালোচনা যে একটা আর্ট এটাই মানুষ ভুলতে বসেছে। সমালোচনা এখন এক প্রকার গালির নাম হয়েছে। তাই যারা প্রকৃত সমালোচক, এরা হয়ে যায় বিদ্রোহী। তাই এখন আর বঙ্গবন্ধুর জীবনী নিয়ে সমালোচনা হয় না, পূজা হয়, পূজা।

বঙ্গবন্ধুর কর্মকে প্রকৃতার্থে মানুষের জন্য উপকারী হিসেবে দেখতে চাইলে, তিনি যেভাবে নেতাদের সমালোচনা করেছেন, তাঁর জীবনী নিয়েও সেভাবে (মৌক্তিক) সমালোচনায় নামতে হবে। আবার সমালোচনা অর্থ কিন্তু কেবলই ভুলগুলো তুলে আনা নয়। বরং ভালো-মন্দ উভয়টা থেকেই শিক্ষণীয় বিষয় বের করতে পারা। তবে গিয়েই বর্তমান ছাত্রদের বুকে পাতি নেতাদের ভুলকে তুল বলায় একটা বিরাট গোদা তৈরি করা যাবে। বঙ্গবন্ধুর জীবন-কর্ম নিয়ে চর্চা করতে হবে। মানব শেখ মুজিবকে সবার সামনে তুলে ধরতে হবে। দেবতা বানিয়ে তুল ত্রুটির উর্ধ্বে রেখে পূজা করে লাভ কী? দেবতা শেখ মুজিব থেকে মানবরা শিখবেই বা কী? অবাক করার বিষয় হলো, অনেক ক্ষেত্রে দেবতাদের সমালোচনা করার সুযোগ মানুষের থাকলেও, আজকের সময়ে মুজিব-সমালোচনা করা মানেই রাতারাতি

রাজাকার কিংবা দেশদ্রোহী বনে যাওয়া। এটাও সত্য যে, আজকাল মুজিবের সমালোচনা হয় না, বিরোধীতা হয়। কিন্তু শিক্ষিত এবং প্রগতিশীলদের এটা ভুললে চলবে না যে, সমালোচনাও এক প্রকার আর্ট। শ্রীশচন্দ্র দাশ বলেন, “যথার্থ সমালোচনা পূজা নহে, পূজাতে শ্রদ্ধা থাকিতে পারে, অন্ধ বিশ্বাসও থাকিতে পারে, কিন্তু পূজায় বিচারবোধ থাকে না। যে সমালোচক ‘পূজার আবেগমিশ্রিত ব্যাখ্যাকেই’ সমালোচনা মনে করেন, তাঁহার কাছে সমালোচনা স্তুতি মাত্র — দোষগুণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা সর্বাঙ্গীণ মূল্য পরিমাপ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে— তাঁহার সমালোচনা ‘ব্যক্তিগত সমালোচনা’রই নামান্তর। এইখানে আরও মনে রাখিতে হইবে, ‘পূজাও’ যেমন সমালোচনা নহে, ‘ঘৃণা’ও তেমন সমালোচনা নহে।”^৬

রবিন্দ্রনাথ বলেন:

জীবনে জীবন যোগ করা

না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।

পরিশেষে বলতে চাই, মানব মুজিবকে মুক্ত করে উন্মুক্ত করতে হবে। তবেই বঙ্গের সবচেয়ে বড় বন্ধুকে বঙ্গের প্রতিটি সন্তান জানা এবং চেনার পাশাপাশি অনুভবও করতে পারবে। আমাদের প্রজন্মকে মুজিবীয় অনুভূতিতে ভাসিয়ে রাখতে হবে। যেই অনুভূতি আমাদেরকে নেতৃত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জ্ঞাতিত্ব শিক্ষা দিবে। আর, মানব মুজিবকে উন্মুক্ত করতে না পারলে, সমাজের সাধারণ মানবের সাথে মানবীয় মুজিবকে যুক্ত করতে না পারলে, বঙ্গবন্ধুর যথার্থ মূল্যায়ন কখনোই সম্ভব হবে না।

তথ্যসূত্র:

১. অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা ২৯
২. প্রাপ্ত, পৃষ্ঠা ৪২-৪৩
৩. নজরুল রচনাবলী, রুদ্ৰ-মঙ্গল, আমার পথ, পৃষ্ঠা ৪২০
৪. অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা ২৮৫-২৮৬
৫. সাহিত্য-সন্দর্শন, শ্রীশচন্দ্র দাশ, পৃষ্ঠা-১০৬
৬. প্রাপ্ত পৃষ্ঠা-১০৮

Science of purifying the heart

Rashedul Bari

یک زمیں صحتب اولیا
بستر از ص سال طاعتبے روا

*A moment spent in the company of the Awliya
is better than a hundred years of sincere worship.*

-Allama Jalal Uddin Rumi

There is no chance of disrespecting their current followers in their unwelcome behavior. Who am I telling them? - I am informing the beloved servants of Allah known as Awliya or Sufi. Whose resting place is called a tomb or Mazar. And we consider the pilgrims of that shrine/mazar as Mushriks (nonbelievers) in the tag of worship. One man does not easily respect or obey another man. But even after so many years of their death, people are approaching them in the hope of getting what! And what they have done that has made everyone bow their heads in reverence to this day! They did only one thing - to please Allah. Not only did they please Allah, but they also gave direction and helped many of their companions to gain the pleasure of almighty Allah. So even today people go to their shrines in search of a way to please the Creator. People

believe that if they get their Nazr-o-karam (eyesight), this path to Allah will be beautiful, easy and perfect. You / I pretended to be a real Muslim today. I became a follower of the complete law! Wait a minute! Take a neutral look at yourself - how far has it been possible to follow the Shariah? But your / my mode today is that there is no real Muslim except me, there are no followers of the law. The followers of Islam who claim to be Muslims are the followers of Allah who have brought us to Islam; Whom we have always cursed. To us, Shari'ah means thirty-two prostrations and seventeen bows. But to them every moment was like prostration. Our race to follow the Shariah is very little compared to their Shariah observance.

Sufism/Islamic mysticism: It's an internal way to discover the creator Allah and the Science

of purifying the heart of Muslim. If anyone wants to thicken with almighty Sufism is the only right and perfect path without any doubt. Annemarie Schimmel the Former Professor of Indo-Muslim Culture, Harvard University get a definition of sufism perfectly - "Sufism, mystical Islamic belief and practice in which Muslims seek to find the truth of divine love and knowledge through direct personal experience of God. It consists of a variety of mystical paths that are designed to ascertain the nature of humanity and of God and to facilitate the experience of the presence of divine love and wisdom in the world."BRITANNICA

Ibn Khaldun, the 14th century Arab historian, described Sufism as: Dedication to worship, total dedication to Allah most High, disregard for the finery and ornament of the world, abstinence from the pleasure, wealth, and prestige sought by most men, and retiring from others to worship alone. RELIGION STUDIES

Verses of Quran about Sufism:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ .

ءَايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لِنَفْسٍ ضَالِّينَ مُبِينٍ

It is He Who has sent among the unlettered people a Noble Messenger from themselves,

who recites His verses to them and purifies them, and bestows them the knowledge of the Book and wisdom; and indeed before this, they were in open error.[Juma`h 62:2]

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهُ • وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهُ .

Indeed successful is the one who made it pure. And indeed failed is the one who covered it in sin. [Shams 91:9,10]

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ ۗ فَوَيْلٌ لِلْقَلْبِئَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أَوْ لَعْنَتِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

So will he whose bosom Allah has opened up for Islam - he is therefore upon a light from his Lord - ever be equal to one who is stone hearted? Therefore ruin is for those whose hearts are hardened towards the remembrance of Allah; they are in open error. [Zumar 39:22]

الْإِنِّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) .
الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (63) لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ

Pay heed! Indeed upon the friends of Allah is neither any fear, nor any grief. (The friends of Allah are the best in the creation.) Those who have accepted faith and practice piety. There

are good tidings for them in the life of this world and in the Hereafter; the Words of Allah cannot change; this is the supreme success. [Yunus 10:62.63.64]

A perfect answer was given in qoura by Talib bah - What are some Quranic verses related to Sufism? Can you write compellingly on Islam? Some terminology: Sufism in arabic: Tasawwuf (Tasawwuf is a scholarly term added later, the original pre-scholarly term for Sufism is Tazkiyah)

Sufi order in arabic: Tariqat

Sufi initiation in arabic: Bay'ah

Sufi meditation practice: Dhikr (or Zikr)

Tazkiyah is mentioned 18 times in the Quran, such as e.g. Surah 62 Ayat 2 [62:2]:

“It is He who has sent among the unlettered a Messenger from themselves reciting to them His verses and purifying (tazkiah) them and teaching them the Book and wisdom - although they were before in clear error.”

Tariqat is also mentioned in Quran, such as e.g. [72:16]: “If only they were to go straight on the Path (Tariqa), We would give them abundant water to drink.”

Sufi initiation Bayah is Sunnah as it was practiced by Prophet Muhammad [saw]. It's also mentioned in the Quran, e.g. [48:18]:

Certainly Allah was well pleased with the believers when they swore allegiance (bayah)

to you under the tree, and He knew what was in their hearts, so He sent down tranquillity on them and rewarded them with a near victory,

For more information on Bayah, please refer to the Authentic Hadith collection Sunan an Nasa'i - The Book of al-Bay'ah. Dhikr is mentioned in more than 525 Hadiths. Also in the Quran, e.g. [33:41]: O ye who believe! Remember Allah (dhikr Allah) with much remembrance.

The core of Sufism is the transformation (or purification) of the soul. Known as Tazkiyah al Nafs. The verses referencing the purification of the soul are in Quran [91:7-9]: By the Soul, and the proportion and order given to it; And its enlightenment as to its wrong and it's right; Truly he succeeds that purifies it.

The word remembrance (dhikr) is mentioned in 254 places in the Quran; the reason it is mentioned so often is to point out that man should not forget Allah. These types of commands and messages in the Quran are the principles that form the basis for Islamic spiritual life and enable the formation of Sufi thought. It is possible to multiply evidence of Islamic spiritual life from the Quran and to increase them in a way to support every Sufi term. And finally we realized the importance of Sufism by the verse of surah Fatiha:

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ • صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

Guide us on the Straight Path. The path of those whom You have favoured. Not the path of those who earned Your anger - nor of those who are astray. [Fatihah 1:6,7]

Hadith about Sufism:

1. Narrated Abu Huraira: One day while the Prophet (peace and blessings be upon him) was sitting in the company of some people, (The angel) Gabriel (peace be upon him) came and asked, “What is faith?” Allah’s Apostle (peace and blessings be upon him) replied, ‘Faith is to believe in Allah, His angels, (the) meeting with Him, His Apostles, and to believe in Resurrection.’ Then he further asked, “What is Islam?” Allah’s Apostle (peace and blessings be upon him) replied, “To worship Allah Alone and none else, to offer prayers perfectly to pay the compulsory charity (Zakat) and to observe fasts during the month of Ramadan.” Then he further asked, “What is Ihsan (perfection)?” Allah’s Apostle (peace and blessings be upon him) replied, “To worship Allah as if you see Him, and if you cannot achieve this state of devotion then you must consider that He is looking at you.” Then he further asked, “When will the Hour be established?” Allah’s Apostle (peace and blessings be upon him) replied,

“The answerer has no better knowledge than the questioner. But I will inform you about its portents.

1. When a slave (lady) gives birth to her master.
2. When the shepherds of black camels start boasting and competing with others in the construction of higher buildings. And the Hour is one of five things which nobody knows except Allah.

The Prophet (peace and blessings be upon him) then recited: “Verily, with Allah (Alone) is the knowledge of the Hour-.” (31. 34) Then that man (Gabriel, peace be upon him) left and the Prophet (peace and blessings be upon him) asked his companions to call him back, but they could not see him. Then the Prophet (peace and blessings be upon him) said, “That was Gabriel (peace be upon him) who came to teach the people their religion.” Abu ‘Abdullah said: He (the Prophet, peace and blessings be upon him) considered all that as a part of faith. (Sahih Bukhari volume 1, hadith 47.)

2. Allah Most High says: “. . . My slave approaches Me with nothing more beloved to Me than what I have made obligatory upon him, and My slave keeps drawing nearer to Me with voluntary works until I love him. And when I love him, I am his hearing with which he hears, his sight with which he sees, his

hand with which he seizes, and his foot with which he walks. If he asks me, I will surely give to him, and if he seeks refuge in Me, I will surely protect him (Sahih al-Bukhari. 9 vols. Cairo 1313/1895.

3. On the authority of Abu Hurayrah (RadhiyAllahu ‘anhu) who said: The Messenger of Allah (Sallallahu ‘alayhi wasallam) said, “Verily Allah (Glorified may he be) has said: ‘Whosoever shows enmity to a wali (friend) of Mine, then I have declared war against him. And My servant does not draw near to Me with anything more beloved to Me than the religious duties I have obligated upon him. And My servant continues to draw near to me with nafile (supererogatory) deeds until I Love him. When I Love him, I become his hearing with which he hears, and his sight with which he sees, and his hand with which he strikes, and his foot with which he walks. Were he to ask [something] of Me, I would surely give it to him; and were he to seek refuge with Me, I would surely grant him refuge.’ ”[Reported by Bukhari]

History of Sufism and its EXTENSION :

Hazrat Muhammad (peace be upon on him) is the main pillar of sufism/Sufis. The actual goal of prophet Muhammad (pbuh) is to gain the pleasure of Allah. So he made his life as Allah wanted it to be. Sufis also want to spent there

life as a perfect follower of Muhammad (pbuh). Ashab-e-Rasulullah (Muhammad's Companions) was the early Sufi saints.

The Naqshbandi tariqah is notable in being the only Sufi tariqah which traces its lineage to Prophet Muhammad (saw) through Abu Bakr as-Siddiq (ra), the first Caliph. All other sufi tariqahs trace their lineage through Ali ibn Abu-Talib (ra), who became the fourth Caliph of Islam.

Sufis in Bengali (Indian Subcontinent) :

An article was published in August 2013 in The Daily Star written by Emdadul Haq - The earliest record of Sufism in Bengal goes back to the 11th century AD in connection with the continuation of Sufism in northern India. Shah Sultan Rumi was the first Sufi to come to Bengal, when he came to Mymensingh in 1053 AD. Subsequently, Baba Adam Shah Shahid came to Dhaka in 1119 AD and Shayekh Jalaluddin Tabrizi, more popularly known as Hazrat Shah Jalal, arrived in Sylhet in 1225 AD. The list of names is a lengthy one.

From 1200-1500 AD Sufism attained its 'Golden Age' in Bengal, being influenced by the diverse Sufi orders of Qadiriya, Chistia, Naksbandia, Mujaddedia, Suhrawardiyya etc. During this period the Sufis of northern India, especially

Hazrat Khawja Muinuddin Chisti and Khawja Bahauddin, sent their deputies to Bengal as torch-bearers of the Islamic faith. In Akbar's reign many religious teachers, including Mujaddid Alf Sani, were sent to this province, where they continued preaching their faith-Islam- among non-believers.

Spirituality and Mental Health :

Spirituality being an integral part of most of the religious philosophies provides the value system for the majority of people and thereby influences their well-being. Recognizing this, the spiritual well-being, in accordance with the social and cultural patterns, was accepted as one of the important determinants of health

by the World Health Organization during the 37th World Health Assembly in 1984.¹ Spiritual teaching has already found its place in the curriculum of many medical schools in the Western world.²

Sufism or Islamic mysticism it's not a matter of neglect or disrespect. Sufism is a approved Road to success for Muslim. Because the purpose of Muslim life is to gain the satisfaction of Allah. If we want to reach our goal and achieve our purpose of life we must follow the Shariya (Islamic Law), obey the tariqa (path of spiritual learning.), Haqiqat (mystical verity, Actual knowledge) Marifat (mystical knowledge).

Reference :

1. Basu S. How the spiritual dimension of health was acknowledged by the world health assembly - A report. *New Approaches Med Health*. 1995;3:47-51.
2. Sims A. 'Psyche' – Spirit as well as mind? *Br J Psychiatry*. 1994;165:441-6.

Student, University of Dhaka.
Researcher, CNCr- Centre for Neutral & Comparative research.

মিমার সিনান : বিশ্বয়কর এক প্রতিভার নাম

মঈনুল কাদের

মিমার মূলত আরবি শব্দ। অর্থ- স্থপতি। তুর্কি ভাষায়ও এটি স্থপতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। সিনান ছিলেন ওসমানি খিলাফতের প্রধান স্থপতি। আজ থেকে প্রায় চারশ বত্রিশ বছর আগের কথা। ওসমানি খিলাফত তখন একশ উনব্বই বছর অতিক্রম করছে। মসনদে ছিলেন সুলতান দ্বিতীয় বাইজিদ বিন মুহাম্মদ আল ফাতিহ। এ সময়ে ওসমানি খিলাফতের এগিরনাস, কারামান ওয়ালাত, বর্তমান তুরস্কের কায়সেরি প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন ‘মিমার সিনান’। পিতা আব্দুল মান্নান ছিলেন আর্মেনিয়ান বংশোদ্ভূত। পরে ইসলাম গ্রহণ করেন।

তিনি বর্তমানের প্রকৌশলীদের মতো ডজন ডজন বই পড়েননি। সিনান পিতার কাছ থেকে কারিগরি শিক্ষা লাভ করেন। তার শিক্ষা ছিলো হাতে-কলমে। তিনি নিজেই এ সম্পর্কে বলেছেন “স্মৃতিস্তম্ভ গুলোতে আমি সমৃদ্ধ অতীতকে খুঁজেছি। প্রতিটি ধ্বংস থেকে আমি নতুন কিছু শিখেছি। প্রতিটি নির্মাণ থেকে আমি কিছু না কিছু গ্রহণ করেছি।”

সিনান ‘ইয়েনিচেরি’ নামক ওসমানি এক বিশেষ বাহিনীতে যোগদানের মাধ্যমে পেশাগত জীবনে পদার্পণ করেন। ইয়েনিচেরি হল এমন একটি সামরিক দল যারা খলিফা কোনো অভিযানে গেলে তাঁকে বেষ্টনী দিয়ে রাখত। এসময়ে তিনি বিভিন্ন সামরিক অভিযানে যোগ দেন ও নানা স্থাপত্যকর্মে হাত দেন। তাঁর আসল প্রতিভার পরিচয় মিলে নির্মাণকাজে। সুনিপুণ নির্মাণশৈলীর গুণে তিনি সেনাপতি থেকে স্থাপতিতে পরিণত হন ও খলিফার নজর কাড়েন।

সিনান মোট চারজন খলিফার রাজত্বকাল পেয়েছেন- সুলতান প্রথম সেলিম, সুলতান সুলাইমান কানুনি, সুলতান দ্বিতীয় সেলিম ও তৃতীয় মুরাদ। এই সুলতানগণের শাসনামলে সিনান তৈরি করেন বিশ্বয়কর সব ভবনসমূহ। যুগান্তর আনেন বিশ্বের নির্মাণরীতিতে।

সুলতান সুলাইমানের শাসনামলে সিনান ‘কারা বুউদান’ অভিযানের সময় প্রুট নদীর উপরে মাত্র তের দিনে ব্রীজ নির্মাণ করে সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরবর্তীতে ১৫৩৮ সালে পঞ্চাশ বছর বয়সে তিনি খিলাফতের প্রধান স্থপতির পদ অলংকৃত করেন। তাঁর শৈল্পিক চেতনা, গভীর চিন্তা, সুদীর্ঘ পরিকল্পনা তাঁকে উসমানি খেলাফতের অন্যতম অংশে পরিণত করেছে।

তখনকার সময়ে ভবন নির্মাণে আয়া সোফিয়াকে আদর্শ মানা হতো। সিনান এমন একটি ভবন নির্মাণের প্রতিজ্ঞা করেন যা আয়া সোফিয়ার বিশালতাকেও ছাড়িয়ে যাবে। এড্রিনের সেলিমিয়ে মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে তিনি সেটি পূর্ণ করেন। তিনি এটিকে তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি মনে করতেন। এর প্রতিটি মিনারের উচ্চতা ছিলো ৮০ মিটারেরও বেশি যা আয়া সোফিয়াকে টপকে দিয়েছিল।

তবে তিনি অধিক পরিচিত ইস্তাম্বুলের সুলেমানি মসজিদের কারণে। কানুনি সুলতান সুলাইমান মিমার সিনানকে এই মসজিদ নির্মাণের দায়িত্ব দেন। এটির নির্মাণ প্রসঙ্গে কিছু চমৎকার গল্প প্রচলিত আছে যা সিনানকে জানতে সাহায্য

করে। কেউ কেউ বলেন এটি নির্মাণের আগে সিনান পাঁচ বছরের জন্য আত্মগোপনে ছিলেন। আবার কেউ বলেন দায়িত্ব দেওয়ার পর উজির একদিন তাঁর কাজ দেখতে গিয়েছিলেন। তিনি দেখলেন সিনান নৌকায় বসে বাঁকাচ্ছেন। নৌকা একবার এদিকে যায় আরেকবার ওদিকে। উজির মিমারের এই গাফিলতির কথা সুলতানকে অবহিত করেন। সুলতান এসে একই অবস্থা দেখে রাগান্বিত হয়ে বিলম্বের কারণ জানতে চান। সিনান বলেন, “সুলতান! এমন একটি কাজ করতে চাই যা অদৃষ্টপূর্ব। সেজন্য তো সময়ের প্রয়োজন।” গত দুই শতক আগে ইস্তাম্বুলে এমন একটি ভূমিকম্পে প্রায় সব পুরনো ভবন ভেঙে পড়লেও সুলেমানি মসজিদ অক্ষত থাকে। ভূমিকম্পের সময় এটি নাকি নৌকার মত এদিক ওদিক যাচ্ছিল কিন্তু কোনো ক্ষতি হয়নি।

সিনানের আর একটি স্থাপত্যকর্ম হলো ‘মেহরিমা সুলতান জামি’। এটি সুলেমানের কন্যা মেহরিমার নির্দেশে তৈরি করা হয়েছিল এর নির্মাণের ১৪ বছর পর সিনান ইস্তাম্বুলের উঁচুতে আরেকটি ভবন নির্মাণ করেন। প্রতি বছর মেহরিমার জন্মদিনের সময় একটি মসজিদের মিনারে এসে সূর্য অস্ত যায় ও অন্যটির মিনার হতে চন্দ্র উদিত হয়। মেহরিমা অর্থ সূর্য সাথে চন্দ্র। সাহিত্যিকগণ এখানে মেহরিমার প্রতি সিনানের মমতার রহস্য লুকিয়ে আছে বলে মনে করেন। এটি কিন্তু সিনানের সূক্ষ্মচিত্তার পরিচায়ক।

তার দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করতেই হয়। সুলাইমানের পুত্র মেহমেদ একুশ বছর বয়সে গুটিবসন্ত রোগে মৃত্যুবরণ করলে তার স্মৃতি রক্ষার্থে সিনানকে একটি কমপ্লেক্স নির্মাণের নির্দেশ দেন। তিনি তা নির্মাণও করেন। পাঁচ শত বছর পরে সেই ভবনের

সংস্কারের কাজ শুরু করলে আধুনিক স্থপতিগণ হিমশিম খেতে লাগল। তখনই তারা দেয়ালের একস্থানে শিশির ভেতর একটি চিঠির সন্ধান পান যা তাদেরকে সংস্কারের পথ দেখিয়েছিল।

একটা মানুষ কতটা দৃঢ়চেতা হলে এ ধরনের কাজ করতে পারেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল হাজার বছর পরে হলেও কেউ এটি সংস্কার করতে চাইবে। এতে ওসমানিদের ইম্পাতকঠিন ইমানের পরিচয় বহন করে। এছাড়াও তিনি মেহমেদ পাশা যাকোলভি ব্রিজ, কিলিচ আলী পাশা কমপ্লেক্স, হাসেকি সুলতান কমপ্লেক্সসহ আরও অনেক বিস্ময়কর সব ভবন নির্মাণ করেন যা বর্তমান যুগের প্রকৌশলীদের পথিকৃৎ হিসেবে ভূমিকা রাখছে।

সিনানের প্রভাব ওসমানি সাম্রাজ্যের গণ্ডি পেরিয়ে পশ্চিমে ইউরোপ ও পূর্বে এশিয়া পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলো। পাশ্চাত্যের স্থপতি মাইকেল এঞ্জেলো, লিওনার্দো দা ভিঞ্চির সাথে তাঁর হৃদয়তা ছিল। তাজমহল নির্মাণেও সিনানের নির্মাণশৈলীর প্রভাব রয়েছে। সিনানের কাজ দেখে প্রাচ্যবিদ বার্নার্ড লুইস বিস্মিত হয়েছিলেন। গত শতকে জাপানি প্রকৌশলীগণ তাঁর নির্মাণ কাজে গবেষণা করে ভূমিকম্প প্রতিরোধক ব্যবস্থা আবিষ্কার করেছে। সে যুগে আগুনের আলোতে বসে বৈদ্যুতিক সাউন্ড সিস্টেমের মাধ্যমে দূরে আওয়াজ পৌঁছানোর কথা কেউ চিন্তা করেছিলো কি?

জি। সিনান সাহেব করেছিলেন। সুলেমানি মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে তিনি লাউডস্পিকার বিহীন বিশাল মসজিদে প্রত্যেক মুসল্লির কানে ইমামের ধ্বনি পৌঁছানোর পন্থা আবিষ্কার করেছিলেন। ছাদ, গম্বুজ ও পিলারগুলো এমনভাবে স্থাপন করেছিলেন যেন ইমামের ধ্বনি সমানে মসজিদের শেষ

কাতারের মুসল্লিও শুনতে পায়। তাঁর কাজ ছিল সাশ্রয়ী। সুলেমানি জামিতে আলোর জন্য ব্যবহৃত বাতিগুলোর ধোঁয়া বা গলিত মোমকে কাজে লাগিয়ে কালি বানানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। সুলেমানি মসজিদের দৃষ্টিনন্দন ক্যালিগ্রাফি গুলো সেই কালিতেই আঁকা।

মহামনিষীগণ পুরাতন কাজই করে থাকেন। তবে নতুন চংয়ে। স্থাপত্যকর্ম সিনানের আগেও ছিল। সিনান কেবল তাতে নতুনত্ব এনেছেন। আবার মহানদের চিন্তা স্বীয় যুগ থেকে কয়েকশ বছর অগ্রসর হয়। যা দুই-তিনশ বছর পরে বাস্তবায়িত হতে দেখা যায়। সিনানের চিন্তাচেতনাও কয়েক

শত বর্ষ এগিয়ে ছিল। এ গুনই তাঁকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসিন করেছে এবং এটিই সিনান চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ দিক। আধুনিক তুরস্ক এখনো তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। তাঁর নিজ হাতের সজ্জা পর্যটকদের বিস্মিত করে, পা বাড়াতে সাহায্য করে ভাবনার নতুন জগতে। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যবিদ বললে অত্যাুক্তি হবে না। ১৭ জুলাই, ১৫৮৮ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের মাধ্যমে শতাব্দীব্যাপী জীবনের ইতি টানেন। সুলেমানি মসজিদে সুলতান সুলাইমানের অদূরে তাঁকে কবরস্থ করা হয়।

সহায়ক গ্রন্থ:

আমার দেখা তুরস্ক : হাফিজুর রহমান

মাস্টার আবুল কাশেম: অনবদ্য এক পথিকৃৎ

হাফেয হামজিদ খান

ক্ষণজন্মা ব্যক্তিবর্গের তরে বিশেষণের সমারোহ থাকা স্বাভাবিক। বিশেষ গুণসমূহের আধিপত্যের কারণে তাঁদের সাধারণ জীবন হয়ে যায় অনন্য, অনুস্মরণীয়। কেউ সেসব গুণ দিয়ে আত্মোন্নয়ন করেন, কেউ বা আবার গুণের বিস্তারে পরোপকারের মাধ্যমে জীবনের স্বাদ গ্রহণ করেন। স্থায়ী গুণের পরিধির বিস্তারে জগত যতবেশি উপকৃত হয়, ততই এসব ব্যক্তিত্ব অনুভব করতে থাকেন পরম সুখ, অপার তৃপ্তি। এই সুখের আবহ তাঁদের নিয়ে যায় অনন্য উচ্চতায়। জীবন নিয়ে ভাবনার পূর্বে স্রষ্টার সৃষ্টি, সৃষ্টির উপাদান নিয়ে ভাবনাটাকে



তাঁদের নিরবচ্ছিন্ন সাধনা জ্ঞান করে থাকেন। তাই ক্ষণজন্মা ব্যক্তিবর্গের মাঝেও তাঁরা হয়ে থাকেন অনন্য পর্যায়ের, যাঁদের পরিচয় প্রদানে বিশেষ কোনো বিশেষণের উল্লেখ প্রয়োজন পড়ে না। অধ্যাপক মুহাম্মদ আবুল কাশেম এমন ব্যক্তিত্বের তালিকায় শীর্ষে অবস্থানকারী একজন সত্তা। শিক্ষকতার অবয়বে গঠিত এই সত্তা লালন করেছেন আরো বিবিধ, বিচিত্র চরিত্র। এই চরিত্র সমাজের প্রয়োজনে, সমাজের উপাদানের উপকারে। শিক্ষকতা তাঁর ধ্যান-জ্ঞান হলেও এই পেশাকে তিনি পরিণত করেছেন অনবদ্য নেশায়। যে নেশায় তিনি ডুবন্ত ছিলেন, সূর্য কিরণ কিংবা সূর্য গমন কোনোকিছুই তাঁর নেশায় হতে পারেনি অন্তরায়।

পরোপকারে মেতে উঠা এই চরিত্র শেষ শ্বাস গ্রহণ অবধি কাটিয়েছেন প্রকৃতির আলয়ে।

দক্ষিণ চট্টলার অসংখ্য ঐতিহ্যের ধারক-বাহক, অগুনিত জ্ঞানী-গুণীর সমারোহে মুখরিত পটিয়া উপজেলার ইয়াকুবদণ্ডী গ্রামে বিংশ শতাব্দীর (১৯৫৭) কোনো এক মাহেন্দ্রক্ষণে ধরায় তাঁর আগমন। শৈশব-কৈশোরের দুরন্তপনায় হামেশা মেতে থাকতো তাঁর আপনালয়। পাড়ার পটু-দাপুটে ছেলে হিসেবে যেমন

পরিচিত ছিলেন, তদ্রূপ সমাদৃত ছিলেন পাড়ার মেধাবী, চৌকস ছাত্র হিসেবে। প্রাতিষ্ঠানিক ফলাফলই এই খ্যাতির আনুষ্ঠানিক প্রমাণ বহন করে। শিক্ষাজীবনের কোনো অংশেই শ্রেণির প্রথম অবস্থানটা হাতছাড়া হতে দেননি আবুল কাশেম। চরিত্র মাধুর্যতা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেধার বিকাশসহ বিবিধ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমে আবুল কাশেম ছিলেন প্রথম সারির অন্যতম একজন। তাই তো শিক্ষাজীবনের পরতে পরতেই শিক্ষকবৃন্দের সুনজরে তিনি উজ্জ্বল ছিলেন, খ্যাতি ছিলো তাঁর বিচক্ষণতার। একজন আদর্শ ছাত্রের সমুদয় গুণের বৈচিত্র্যময় উপস্থাপন ছিলো তাঁর শিক্ষাজীবনে। প্রাথমিক পড়াশোনা বাবা-মার ছায়া ও

গ্রামের মজুবে শেষ করেন দুরন্ত কাশেম। সর্বোচ্চ সফলতার সাথে মাধ্যমিক পরীক্ষা সম্পন্ন করেন দক্ষিণ চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হাবিলাসদীপ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে গিয়েও ধারাবাহিক সাফল্য অব্যাহত থাকে। ক্লাসের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় সাফল্য অর্জনকারী কাশেম ১৯৭৬ সালে ছলাইন ছালেহ নুর ডিগ্রি কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে এইচএসসি পরীক্ষা সমাপ্ত করেন। শিক্ষা জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ দুই অধ্যায়ে ধারাবাহিক সাফল্যের পর উচ্চতর পড়াশোনার জন্য অনার্সে যুক্ত হন পটিয়া কলেজে। দীর্ঘদিন যাবৎ একই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাজীবন পার করায় ক্যাম্পাসজুড়ে ছড়িয়েছে কাশেম পুষ্পের সৌরভ। ক্লাসের সিনিয়র-জুনিয়র নির্বিশেষে অনেকেই তাঁর কাছে আসতো পড়াশোনা সংক্রান্ত বিবিধ সমাধা' নিতে। আবুল কাশেমও পরম যত্নে পরিচয় নির্বিশেষে সবার প্রতি আন্তরিক থাকতেন। বহুমুখী প্রতিভাধর আবুল কাশেম ১৯৮২ সালে পটিয়া কলেজের পাঠ চুকিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ ডিগ্রি অর্জন করেন ১৯৮৪ সালে। বিশ্ববিদ্যালয় আঙিনায়ও কাটিয়েছেন এক বর্ণাঢ্য সময়। মেধার স্বাক্ষর রেখে অর্জন করেছেন বিবিধ স্কলারশীপ। রঙিন শিক্ষাজীবনের সমাপ্তিতেই শুরু হয় নতুন অভিজ্ঞতা। শিক্ষাজীবনেই তিনি অন্যান্য ছাত্রদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন এবং অপরকে শেখানোর প্রতিও ছিলো তাঁর আগ্রহ বিশেষ। তাই শিক্ষাজীবনের সমাপনান্তেই শিক্ষকতার পেশায় যোগ দেন ১৯৮৪ সালে। দক্ষিণ চট্টলা তথা চট্টলার প্রাচীন মাদরাসা, ঐতিহ্যবাহী শাহচান্দ আউলিয়া কামিল মাদরাসায় অধ্যাপনার মাধ্যমে শুরু হয় তাঁর শিক্ষকতার জীবন। শিক্ষকতার এই পেশা রূপান্তরিত হয় তাঁর নেশায়। তাই অধ্যাপনার শুরু থেকেই শিক্ষার্থীদের মনে এক বিশেষ স্থান তৈরি করে নিয়েছিলেন তিনি। মানবিক আবুল কাশেম শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সমস্যাটির

কথাও মনোযোগ দিয়ে জেনে নিতেন। শিক্ষার্থীদের প্রতি তাঁর এই মানবিক আচরণ তাঁকে শিক্ষার্থীদের হৃদয় গহীনে পৌঁছে দেয়। তাঁর এই উদারতা, মানবিকতা ও আন্তরিকতা ছিলো জীবন আঙিনায় প্রতিটি মুহূর্তে, এমনকি শেষ মুহূর্ত অবধি।

পরবর্তীতে তিনি আরো কিছু প্রতিষ্ঠিত ও বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার মাধ্যমে শিক্ষার আলো ছড়ান। রাউজান নুরুল উলুম, চট্টগ্রাম সোবহানীয়া কামিল মাদরাসা ও চট্টগ্রাম দারুল উলুম মাদরাসা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনার মাধ্যমে লব্ধ অভিজ্ঞতা নিয়ে ১৯৯৯ সালে যোগ দেন মহাদেশখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসায়। তাঁর শিক্ষকতার মূল আবেগ-অনুভূতি, শিক্ষকতার প্রকৃত ঘ্রাণ যেন তিনি এই প্রতিষ্ঠানে আবিষ্কার করেন। অতীত অভিজ্ঞতা ও চলমান অনুভূতির সমন্বয়ে সর্বোচ্চ উদ্যমে জামেয়ায় শুরু করেন নতুন এক পরিক্রমা। এই পরিক্রমা সময়ের পরিক্রমা, শিক্ষকতার পরিক্রমা, মানবিকতার পরিক্রমা, ভালোবাসা-শ্রদ্ধা-সম্মানের পরিক্রমা। চেষ্টায় সাফল্য আনে- প্রবাদটির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হতে পারেন অধ্যাপক আবুল কাশেম। স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি জামেয়া আঙিনায় প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিটি স্তরেই ইতিবাচক অবস্থান তৈরি করে নেন। বিশেষত, শিক্ষক হিসেবে শিক্ষার্থীদের মাঝে তৈরি করে নিয়েছেন বিশেষ অবস্থান। পেছনের সারির কোণের ছাত্রটাও গভীর মনোযোগী হতো তাঁর ক্লাসে। ক্লাস চলাকালীন শ্রেণিকক্ষের অভ্যন্তরে থাকতো পিনপতন নীরবতা। ছাত্রদের মাঝে তাঁর বৈচিত্র্যময় সুপ্ত প্রতিভার যেমন প্রকাশ ঘটতো, অনুরূপ ছাত্রদেরও বিবিধ প্রতিভার প্রকাশে, প্রকাশ পরবর্তী লালন-পালনে তিনি ছিলেন অনন্য। প্রতিজন ছাত্রের প্রতিই তিনি ছিলেন আন্তরিক, স্নেহমহী ও

উদার। শিক্ষকতা, মানবিকতা ও অগুনতি বিচিত্র গুণ তাঁকে শিক্ষার্থীদের হৃদয়ে পৌঁছে দিয়েছে গভীরতম স্থানে। অনুরূপ, সহকর্মী-সহযোদ্ধা, পথের পথিক পরিচয় নির্বিশেষে সবাই পেতো তাঁর কোমল আচরণ, আন্তরিক দৃষ্টি। সর্বোপরি, শিক্ষকতার দায়িত্বের পাশাপাশি মনুষ্যত্বের অবস্থানেও তিনি খ্যাতিমান, সর্বজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। অত্যন্ত সফলতা ও নিষ্ঠার সাথে জামেয়ায় প্রায় দুই দশক খেদমত করে যান। জীবনের শেষ শ্বাস গ্রহণ অবধি তিনি কাটিয়েছেন এই আঙিনাতেই।

শিক্ষকতার পাশাপাশি সাহিত্য সাধনায় ব্রতী ছিলেন এই গুণী। বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক পত্রিকাসহ বাৎসরিক ম্যাগাজিনে তাঁর শব্দসম্ভারের মিলন ঘটতো অনবদ্য লেখনীর দ্বারা।

শিক্ষার্থীরা তাঁর শব্দচয়নে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সহোদন করে ‘শব্দসম্রাট’ হিসেবে। তাঁর লেখনী সত্তাটাকে আলাদা করে বর্ণনাযোগ্য। মনোমুগ্ধকর শব্দের সমাহার, বাক্য গঠনের বৈচিত্র্যময় ধারা, সর্বোপরি প্রবন্ধ, কবিতাসহ সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি বিনা বাঁধায় লিখতে পারতেন। শিক্ষার্থীরা তাঁদের বিভিন্ন লেখনী সংশোধন করিয়ে নিতো তাঁর দ্বারা। বাচনভঙ্গিতে তিনি যেমন ছিলো দৃষ্টিনন্দন, লেখনীতেও ছিলো তাঁর সমান পারদর্শিতা। বিশেষত, তাঁর

হাতের লেখা ছিলো চোখ জুড়ানো। শত ব্যস্ততার মাঝেও প্রকাশ ঘটিয়েছেন কতিপয় লেখনী।

“প্রজ্ঞা, পারমিত ও অন্যান্য” নামে তাঁর একখানা কাব্য পুস্তক আছে। তাছাড়া “চেনা পথ অচেনা পথিক” নামে আছে আরেকটি চমকপ্রদ বই।

মাধ্যমিক পর্যায়ের বাংলা ব্যাকরণে বিষয়ে তাঁর আছে তিনটি স্বরচিত ব্যাকরণ বই। জীবনকালের সংক্ষিপ্ত সময়ে তিনি চেষ্টা করে গেছেন সাহিত্য সাধনায় আপন কিছু ছোঁয়া রেখে যেতে। জীবন ঘড়ি যদি আরো দীর্ঘ হতো, তবে এই সাধনার তালিকা হতো আরো দীর্ঘতর; তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

২০১৭ সালের ৯ নভেম্বর দুনিয়ার আকাশ পেরিয়ে গহীন অন্ধকারে যাত্রা করেন তিনি। একজন মাদরাসা শিক্ষিত আলেমে দ্বীন না হয়েও তাঁর প্রিয় প্রতিষ্ঠান জামেয়ার হাজারো শিক্ষার্থীদের দ্বারা তাঁর শেষ বিদায় মুহূর্তের দৃশ্য, বিবেকবান মানুষমাত্রই নতুন করে জীবন নিয়ে ভাবনার উদ্রেক ঘটাবে নিঃসন্দেহে। তাঁর স্মৃতি বিজড়িত আপন গ্রাম হুলাইন এয়াকুবদণ্ডীতে তিনি শায়িত আছেন। বছরব্যাপী তাঁর অগুনতি শিক্ষার্থী কবর যিয়ারতে যায় এবং বাৎসরিক একবার ওফাতবার্ষিকী আয়োজন হয়। রাব্বুল আলামিন তাঁকে জান্নাতের সর্বোচ্চাসনে সমাসীন করুন। আমিন বিহুরমাতি সায্যিদিল মুরসালিন।

কয়েকজন বিখ্যাত সুফি সাধক এবং ফকির উল্লাস

এম এয়াকুব আলী বাদশা

‘ফকির’ বিশেষ্যটি শুনলে মানুষের চিন্তার জগতের স্বর অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন চিত্র মনে ফুটে উঠে। বাংলার অপামার জনতা তাদের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনে বহু কিছিমের ফকিরের দর্শন পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে, এই ফকির নিয়ে লোকমুখে রয়েছে রঙবেরঙের নানা কথা। ফকির বলতে আবার দেশের বড় একটা অংশ মনে করে ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে নেওয়া ভিক্ষুকদের। অনেকে অজ্ঞাতসারে এদের ফকির সম্বোধন করলেও, বস্তুত ‘ফকির’ বিশেষ্যটি অনেক উচ্চস্তরের মানবদের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই উপমহাদেশের মানুষ পীর-ফকির, সুফি-দরবেশদের আদিকাল হতে সম্মানের চোখে দেখেন, যথাসাধ্য ভক্তি করেন। ফকিরদের সংজ্ঞা ঠিক কী রকম হলে যথার্থতা লাভ করবে বলা মুশকিল, তবে মনে আসছে কোন এক বিখ্যাত সুফি ব্যক্তির একটি অভিমত, “কোন সাধকের বাম কাঁধের ফেরেশতা যদি টানা ২০ বছর তাঁর আমলনামায় কোন গুনাহ লিখার সুযোগ না পায় তখনই সে ফকির হিসাবে সব্যস্থ হবে।”

মহিউদ্দীন ইবনুল আরাবি, মনসুর হল্লাজ, শামসে তাব্রিজ, জালালুদ্দীন রুমি, খাজা আজমেরি ও গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারী সহ এই ধরাধামে অজস্র ফকির দরবেশদের আগমন ঘটেছে। এর মধ্যকার কতশত সুফি-দরবেশ-ফকির সম্পর্কে আমাদের জানাশুনা আছে সেটাও একটা ভাববার বিষয়, বা আমরা বিখ্যাত যাদের সম্পর্কে মোটামোটি জ্ঞান রাখি তাঁদের সম্পর্কে আমাদের জানার জ্ঞানের পরিধিটা কতটুকু সেটাও গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়।

শায়খুল ইসলাম মহিউদ্দীন ইবনুল আরাবি ছিলেন একজন জ্ঞান তাপস ফকির দরবেশ, বলবে প্রভুর সান্নিধ্য পাওয়া ছিলো তাঁর রেয়াজতের অন্যতম বিষয়। তাঁর সাধনার অন্ত ছিলনা, দেশ হতে দেশান্তরি ঘুরে ঘুরে সাধনা করতেন। কিছুদিন মক্কা তো আবার কিছুদিন মদিনায় সাধনা করতেন। সেলজুক সাম্রাজ্যে ছিলেন তাঁর বসবাস, ভিবিদ্য পাহাড় জঙ্গলে নিরবে নিবৃত্তে সাধনা করতেন ও বিভিন্ন সৃষ্টিতে প্রভুর রহস্য উদ্ঘাটন করে যেতেন। প্রভুর সর্বব্যাপী অস্তিত্ব নিয়ে তিনি সাধনায় মগ্ন থাকতেন। দরবেশদের সাথে মিলিত হলে গভীর অরণ্যে একসাথে ‘হেলেদুলে’ জিকিরে রত থাকতেন, দীর্ঘ সময় জিকিরে মশগুল থাকার পর আত্মিক তৃপ্তি আসার পর তারা শান্ত হতেন।

আবু উমর হোসাইন বিন মনসুর হল্লাজ ছিলেন এক মহান দরবেশ ফকির। মরমী প্রেমের জীবন্ত কিংবদন্তি, শহীদত্বে পরম সত্তার প্রামাণিক সাক্ষ্যরূপে যিনি সমুজ্জ্বল। তাঁর দেহের প্রতিটি অনু-পরমানুই যে সাক্ষ্যের জলন্ত প্রমাণ। ‘আনাল হক’ থেকে মনসুর হল্লাজকে নাড়তে পারেননি কেউ। এমনকি ‘আনাল হক’ এর জন্য তার প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করতে দ্বিধাবোধ করেন নি।

মনসুর হল্লাজ একটি জিকিরেই মশগুল, যেন এতেই তার সকল প্রাপ্তি, সেই জিকিরে তার সকাল হয় সন্ধ্যা নামে; তা হলো- আনাল হক, আনাল হক, আনাল হক। ‘আনাল হক’ বলা থেকে সরে না আসার দরুন তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হলো, জল্লাদ আবু হারিস তাঁর মুখে ঘুষি মারতেই নাক মুখ দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকলো। তারপর মারা

হলো পাঁচশত চাবুক! দেহ নিখর, তাও একটিমাত্র বাক্য উচ্চারিত হয় ‘আনাল হক’। এরপর হল্লাজকে ত্রুশে চড়ানো হলো, প্রথমদিন ছিন্ন করা হলো দুই হাত আর দুই পা, এই অবস্থায়ও একটি মাত্র কথা মুখে: ‘আনাল হক’! দ্বিতীয় দিন কাটা হলো তাঁর মাথা। উপস্থিত শিবলি, ওয়াসিতি ও অন্যান্য সুফি দরবেশরা চিৎকার করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। ‘আনাল হক’ ধ্বনি ধ্বনিত করে এ মর্তধাম হতে বিদায় নেন হল্লাজ।

শামস উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মালিকদাদ তাবরিজি। হিজরি ৬৪২ সালের ২৬ জমাদিউস সানি শনিবার সকালে তিনি কুনিয়ায় পৌঁছেন। অভ্যাস অনুযায়ী কুনিয়ায় চিনি ব্যবসায়ীদের সরাইখানায় (হোটেল) উঠে একটি কামরা ভাড়া নেন। তার কামরার দরজায় দুই থেকে তিন দিনার মূল্যের তালা ঝুলিয়ে দিতেন। তালায় চাবিটি গায়ের চাদরের কোণায় বেঁধে কাঁধের ওপর ছেড়ে দিতেন। যাতে সাধারণ লোক ধারণা করে, তিনি বড় একজন ব্যবসায়ী। অথচ কামরার ভেতরে পুরনো মাদুর, ভাঙা কলসি ও খড়ের বালিশ ছাড়া অন্য কিছু থাকত না। সফরকালীন জীবিকা নির্বাহের জন্য তিনটি পেশা অবলম্বনের কথা তার আত্মজীবনীতে পাওয়া যায়। যেমন পাজামা সেলাই, পরিচয় গোপন রেখে নির্মাণ শিল্পে কুলির কাজ এবং বাচ্চাদের কোরআন মজিদের তালিম দেয়া।

রুমির মতো বিশ্বজনীন কবিকে যিনি উদ্দীপিত ও প্রভাবিত করেছেন সেই সন্ত বা দরবেশ শামসের বাক্যের বাঁকে যে ইশারার ঝিলিক, যে দৃশ্য-সুসমা তা উপলব্ধি বা ধারণ করার মতো শিষ্য পাওয়াও দুষ্কর। শামস তাবরিজি ছিলেন একজন ইরানি সুফি সাধক। নির্জনতাপ্রিয় এই জ্ঞানতাপস জীর্ণ পোশাকে ঘুরে বেড়াতেন একা। শামস তাবরিজি সম্পর্কে

আজো বিশ্ব ইতিহাসে বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত তেমন পাওয়া যায় না। মূলত, তিনি এমন এক সত্ত্বা যিনি নিজেকে নিজের মধ্য দিয়ে বিকশিত করতে চাননি। তিনি প্রকাশিত হয়েছিলেন তাঁর শিষ্য এবং পরম বন্ধু সুফি সাহিত্যিক, দার্শনিক কবি জালালউদ্দীন রুমীর মধ্য দিয়ে।

তাবরিজ তিনি ছিলেন সময়ের সুফিসম্রাট। তিনি ছিলেন নির্জনতা প্রিয় এবং একা। পরিব্রাজক ছিলেন বলে তাকে পারিন্দা বলা হতো। তিনি এক জায়গায় স্থির থাকতেন না। ঘুরতেন নানা স্থানে; পাহাড়, অরণ্য, মরুতে।

জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ রুমি হতে শামসে তাবরিজ নিরুদ্দেশের পর বিচ্ছেদের বিষাদে ভেঙে পড়েন রুমী। তিনি এই বিচ্ছেদের সাগরে নিমজ্জিত হতে থাকেন এবং অন্তরের চোখ দিয়ে ভালবাসার মহাসমুদ্রে উপনীত হন তিনি। তাবরিজির সঙ্গে বিচ্ছেদের পর তিন দশক ধরে রুমি কাব্য, গীতি ও নৃত্যকে ধর্মীয় চর্চায় আত্মীকরণ করেন। ঘূর্ণনৃত্যে পাক খেতে খেতে ধ্যান করতেন, মুখে মুখে কবিতা রচনা করে ফিরতেন। তাঁর এই অসাধারণ দরদী ভালবাসার মাখনে আচ্ছাদিত কাব্যের জন্য তিনি আনন্দ ও ভালোবাসার কবি হিসেবে খ্যাতি পেয়েছেন।

‘মালাকাতে শামসে তাবরিজ’ ও ‘দিওয়ান-ই শামস তাবরিজ’ গ্রন্থে তাঁর গুরুকে হারানোর যন্ত্রণার কথা বর্ণনা করেছেন। গুরু-শিষ্যের মধ্যে পবিত্র আধ্যাত্মিক বন্ধন ভেঙে গেলে একজন প্রেমিক শিষ্য কী যন্ত্রণা ভোগ করেন তার বর্ণনা পাওয়া যায়।

রুমির সঙ্গে যখন শামস তাবরিজির পরিচয় হয় তখন তাবরিজির বয়স ষাট, তবে তাবরিজি ছিলেন খুবই শক্তিশালী

এক আধ্যাত্মিক পুরুষ। তাঁকে লোকে ‘পাখি’ বলে ডাকতেন। মানুষের বিপুল কৌতূহল ছিল তাঁকে নিয়ে। খুবই রহস্যঘেরা ছিল তাঁর জীবন। এর কারণ, তিনি এক জায়গায় বেশিক্ষণ স্থির থাকতেন না। দ্রুত অন্যত্র চলে যেতেন। মনে হতো তিনি যেন কী খুঁজছেন, কাকে যেন খুঁজছেন। তিনি সবসময় একজন পরম জ্ঞানী শিষ্য খুঁজতেন। তাঁর একজন যোগ্য উত্তরসূরি প্রয়োজন ছিল। শেষ পর্যন্ত রুমির মধ্যে সেই গুণ খুঁজে পাওয়ার পর বোঝা গেল আসলেই তাবরিজি কি খুঁজছিলেন। বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত হতে জানা যায়, রুমির ব্যক্তিত্ব ছিল সাংঘাতিক আকর্ষণীয়। ধীরে ধীরে তাবরিজির কাছে রুমির অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কারণে আকর্ষিত হন তাবরিজি।

খাজা মইনুদ্দীন চিশতী আজমেরী, খোরাসানে তাঁর জন্ম। ১৫ বছর বয়সের মধ্যে পিতামাতা মারা যান। একদিন উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ফল বাগানে কাজ করছিলেন, ক্লান্ত মইনুদ্দীন বসে ছিলেন এমতবস্তায় আসেন এক ব্যক্তি, মইনুদ্দীন তাকে কিছু ফল দিয়ে আপ্যায়ণ করেন। ব্যক্তিটি ছিলেন বিখ্যাত সুফি দরবেশ শেখ ইবরাহিম খুন্দুসী। তিনি মইনুদ্দীনকে এক টুকরো রুটি খেতে দিলেন, এরপর তাঁর হৃদয়ে অন্যরকম অনুভূতি জাগ্রত হলো, হয়ে পড়লেন উদাসীন। সব ধনসম্পদ গরিবদের বিলিয়ে বের হয়ে পড়লেন সাধনার নেশায়।

খাজা মইনুদ্দীন চিশতী বোখারা থেকে নিশাপুরে আসেন। সেখানে চিশতীয়া তরীকার অপর প্রসিদ্ধ সুফি সাধক খাজা উসমান হারুনীর নিকট মুরীদ হন/শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তার সেবায় ২০ বছর একাগ্রভাবে নিয়োজিত ছিলেন। পরে উসমান হারুনী তাকে খিলাফত বা সুফি প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেন। তিনি ইরাকের বাগদাদে বড়পীর গাউসুল আযম

আবদুল কাদির জিলানীর সাহচর্যে ৫৭ দিন অবস্থান করেন। তার জীবনীতে বর্ণিত আছে যে, এ সময় আব্দুল কাদির জিলানী তাকে উদ্দেশ্য করে বলছিলেন, ইরাকের দায়িত্ব শায়েক শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দীকে আর হিন্দুস্থানের দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া হলো। তিনি আরব হতে ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান হয়ে প্রথমে লাহোর পরে দিল্লী হয়ে আজমিরে বসতি স্থাপন করেন।

লাহোরে তিনি শায়খ দাতা গঞ্জবক্স লাহোরী এর দরবারে কিছুদিন সাধনা করে আজমীর আসেন।

সেখান হিন্দু রাজা, হিন্দু তান্ত্রিক, যোগীরা তাঁকে নানা কৌশলে থামানোর চেষ্টা করেন। তিনি তাঁর ৪০ জন শিষ্য নিয়ে ইসলামের আমলগুলো করতে থাকেন এবং দলবদ্ধ হয়ে ধ্যান ও জিকিরে মশগুল থাকতেন। দরবেশ খাজা সাহেব ও তাঁর শিষ্যদের দেখতে হাজার হাজার হিন্দুরা চারপাশ থেকে আসতে থাকে এবং খাজা মইনুদ্দীন চিশতীর রেয়াজত ও অজ্জদ এর তালে তালে তারা মগ্ন ও মোহিত হয়ে পড়ে। দলে দলে তার হাতে ইসলামের বায়াত গ্রহণ করতে থাকে এবং হিন্দুস্থান ইসলামের শামিয়ানা উড়তে থাকে।

সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী। বাবা ভাণ্ডারী নামে যিনি সর্বাধিক খ্যাত। বাংলাদেশে বানিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রাম হতে ২৪ মাইল উত্তরে মাইজভাণ্ডার নামে ছোট্ট গ্রাম, এই গ্রামের ভৌগলিক অবস্থান যে কোন ভাবুক প্রাণের চোখে ধরা পড়ে। তার নৈসর্গিক শোভা, সারাটি দেহ শ্যামল শোভায় ঝলমল, তার পাশে ছোট প্রবাহিণী কুল কুল রবে বয়ে চলেছে, অফুরন্ত ঘন বনানীর কাজলকালো ছায়া তাকে বেষ্টিত করে আছে গভীর মায়ায়। সেই ছবির মতো সুন্দর ছোট্ট গ্রামে গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারীর জন্ম।

শিশুকাল হতে তিনি ছিলেন খুব অল্পভাষী। মাত্র ৮ বৎসর বয়সে শেষ রাতে ঘরের বারান্দায় আলো দেখে মাতা ঘুম থেকে উঠে বাইরে চেয়ে দেখে তাঁর ছোট্ট শিশু সালাত আদায় করছেন এবং তাঁর আলোয় চারপাশ আলোকিত হয়ে গিয়েছে। যুবক বয়সে বহদ্রার পাড়া চৌধুরি বাড়িতে জায়গীর থেকে তৎকালীন চট্টগ্রাম মোহছেনিয়া মাদ্রাসায় লেখাপড়া শুরু করেন। যাদের ঘরে জায়গীর তাদের দেওয়া রাতের খাবার সাহরি হিসেবে গ্রহণ করতেন শেষ রাতে। সারারাত বহদ্রার বাড়ি জামে মসজিদে ইবাদতে মশগুল থাকতেন, এবং গৃহকর্তা জানতে পেরে কী করেন তা দেখতে গেলে; দেখতে পান সাদা পোশাকধারী অনেক ব্যক্তি তার পেছনে এক্তেদা করছেন। তিনি ছিলেন মূলত ‘ছায়েমুদ্দাহার’ ও ‘কিয়ামুল লাইল’ তথা সারাবছর রোজা পালনকারী ও সারারাত দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারী সাধু পুরুষ। এই ঘটনা বহদ্রবাড়ি জানাজানি হয়ে গেলে তিনি অল্পদিনের মধ্যে সেখান থেকে প্রস্থান করেন।

তিনি তাঁর মিতামহ/মুর্শিদের প্রতি এতোটা প্রেমাসক্ত ছিলেন যে, পরীক্ষাকক্ষ হতে কাগজ কলম ছুড়ে ফেলে একেবারে চলে আসেন। এবং সর্বদা নিজ মুর্শিদের পানে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন। দিন দিন অবস্থা আরো ভয়াবহ রূপ নেয়; রোদ, বৃষ্টি বা রাত, দিন সর্বদা মুর্শিদের দিকে অপলক দৃষ্টিতে ছেয়ে থাকে। ঘরে বন্ধি করে রাখলে এমন অবস্থা হয় সকলে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

এরপর আসে গভীর অরণ্যে সাধনা কাল। একেক সময় একেক স্থানের গভীর জঙ্গলে গিয়ে ধ্যানে মগ্ন থাকেন। চট্টগ্রামের পূর্ব পার্বত্য পাহাড়, দেয়াঙ্গের পাহাড়, সীতাকুণ্ড পাহাড়, রাসুনুয়া পাহাড়, খিরাম পাহাড়, উত্তরা পাহাড় সহ চট্টগ্রামের প্রায় সব পাহাড়েই তিনি প্রভুর ধ্যান সাধনায় মগ্ন

থাকতেন। তাঁর ভ্রাতাগণ তাঁকে খুজে আনতেন সুযোগ বুঝে তিনি আবার চলে যেতেন।

তিনি পড়ে ছিলেন নিরবতার মোহর, দীর্ঘ ২৩ বৎসর তেমন কোন কথাই বলেন নি, শুধুমাত্র ইশারা করতেন। গহীন জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে বহু কারামতগুলো তাঁর জীবনীতে পরিলক্ষিত হয়। অতঃপর যখন শাহ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী ধরাধাম ত্যাগ করার সময় হলে খলিফা পাঠিয়ে তাঁকে গহীন জঙ্গল থেকে দরবার নিয়ে আসার জন্য পাঠান, আসার কিছুদিন পর আবার তিনি গহীনে হারিয়ে যান। হযরত আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর পর তিনি মাইজভাণ্ডার সিংহাসনে আরোহন করেন। তরিকার ব্যাপক প্রসার ঘটান, বার্মা, ভারতসহ নানা দেশ হতে আশেকগণ তার কাছে চুম্বকের ন্যায় ছুটে আসতে থাকে।

উল্লেখিত সূফি দরবেশগণ ছিলেন জামানার শ্রেষ্ঠ ফকির। তবে তাঁদের কাজের ধরন, প্রেক্ষাপট, অবস্থা ছিলো ভিন্নতর। কেউ ছিলেন রহস্যে ঘেরা মহাপ্রতিম, কেউবা আপন প্রভুকে ক্লবে ধারণ করে ‘আমিই সত্য’ প্রতিষ্ঠার জন্য অন্তর্ধান, অন্যজন পাখির মতো দ্রুত পরিব্রাজক হয়ে ইশকে এলাহিতে মগ্ন হয়ে নিজ শিষ্যের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ, বা নিজ মুর্শিদ কর্তৃক আপন হৃদয়ের সঠিক ঠিকানা পাওয়া কোন মহামণ্ডিত নিজ কিতাব কালাম ছেড়ে দিয়ে মুর্শিদ প্রেমে বিভোর হয়ে পড়া, অন্যজন বহু গুরুর শিষ্যত্ব লাভের পর মইনুদ্দিন নাম ধারণ করে উপমহাদেশের ইসলামের ঝাঞ্জা তুলে ধরেন, অন্যজনতো নিজেকে ফানা করে ভাণ্ডারের চাবি নিয়ে ঘোষণা করেই দিলেন, “আমি স্রষ্টার গুণে গুণাস্বিত, প্রকৃতির ন্যায় উদায়।”

এই সকল পীর-ফকির-দরবেশগণের প্রত্যেকের আত্মার মধ্যকার প্রভু-প্রেমের ঝংকার উপলব্ধি করতে পারার অমৃত সুখা ভিন্ন, কিন্তু উদ্দেশ্যে একই। তাই তো, ইবনে আরাবির ওহদাতুল ওজুদের উদ্দেশ্যে হেলে-দুলে জিকির করা ও প্রত্যেক কিছুতে প্রভুকে খোঁজ করা, প্রভু জ্যোতিকে মনসুর হজ্জাজের হৃদয়ে ধারণ করে আনাল হকে ফানা হওয়া, তারিজের পরিব্রাজক হয়ে গভীর অরণ্যে প্রভুর ইয়াদগারী, রুমির ঘূর্ণায়মান নৃত্যের তালে তালে জিকির করে হৃদয়ে প্রভু প্রেমের প্রশান্তি লাভ করা, মঈনুদ্দীন চিশতির শিষ্যদের

নিয়ে জিকিরে এলাহিতে মগ্ন হওয়া, সুকৌশলে অমুসলিমদের মুসলিমে পরিণত করে প্রভুর ইয়াদগারীর তৃপ্ত করা এবং বাবা ভাণ্ডারীর সেমার মাধ্যমে জিকিরে ইলাহিতে মশগুল হয়ে আশেকদের হৃদয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করে প্রভুর সুখা পানের প্রাপ্তিই হলো প্রত্যেকজন সুফি দরবেশের ভিন্ন কিন্তু একই উদ্দেশ্য সাধনে আসা পরম পাওয়া। আর এই পরম পাওয়ার চিরতৃপ্ত হওয়ার মছর্ত উদযাপনে প্রভু সমীপে অজ্ঞদ, জিকির, সামা, নৃত্যে মশগুল থেকে যে উল্লাস করা হয় সেই উল্লাসই হলো; ফকির উল্লাস।

আধো ঘুমে ক্যাস্ট্রোর সঙ্গে : শাহাদুজ্জামান

ঐতিহ্য প্রকাশনী

আলোচক: মিঠুন সরকার



পৃথিবীর সব স্থল ডুবে গেছে কোন বিস্কুদ্র জলোচ্ছ্বাসে। শুধু রাজার একরোখা প্রচেষ্টায় রক্ষা পেয়েছে ১০৯৮৮৪ বর্গ কিলোমিটারের এক ক্ষুদ্র দ্বীপ। কিন্তু সেই ঝড়, সেই জলোচ্ছ্বাস থামেনি। সময়ে সময়ে হয়ে উঠেছে আরও উগ্র, আরও বিস্কুদ্র। নিজের মাতৃভূমির প্রতি কঠোর পরিশ্রম আর গভীর মমতায় রাজা আরও ১৫ টি বছর আগলে রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পিছনে রেখে যান আদর্শের যুদ্ধকে জনযুদ্ধে রূপান্তরের এক অসামান্য দৃষ্টান্ত। সেই দ্বীপটির নাম কিউবা। রাজার নাম কিংবদন্তী ফিদেল ক্যাস্ট্রো। আর সেই বিস্কুদ্র ঝড় হলো সম্রাজ্যবাদ। যার প্রধান অভিভাবক কিউবা থেকে মাত্র ৯০ মাইল দূরের দেশ সর্বোচ্চ শক্তিমান যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৯১ সাল। তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে গেল সমাজতন্ত্রের স্বপ্নঘর সোভিয়েত ইউনিয়ন। জন্ম নিল একের

পর এক রাষ্ট্র। লেনিনের অক্টোবর বিপ্লব পৃথিবীকে শোষণমুক্তির যে স্বপ্ন দেখিয়েছিল আয়ু পেল মাত্র ৮৪ বছর। কিন্তু সমাজতন্ত্রের শরীর অর্থব হলেও প্রাণটুকু আজও যেন ধুকে ধুকে বেঁচে আছে কিউবায়। সেই কিউবা প্রাণশক্তির রহস্য নিয়ে শাহাদুজ্জামান লিখেছেন তাঁর ডকু ফিকশন আধো ঘুমে ক্যাস্ট্রোর সঙ্গে। যেখানে বাংলাদেশের এক স্বপ্নবাজ তরুণ হাজির হয় ক্যাস্ট্রোর কাছে। ক্যাস্ট্রোও যেন অনেকদিন পর কারও সাথে কথা বলতে পেরে উচ্ছ্বসিত হন। বলে যেতে থাকেন একের পর এক শৈশব থেকে সংগ্রামের জীবনের সেরা মুহূর্তগুলোর কথা। কিউবা ছিল সত্যিকার অর্থে ক্যাস্ট্রোর মাতৃভূমি। ১৫৯২ সালে কলম্বাসের হাজার কিউবার বেলাভূমির স্পর্শ করার খুব অল্প সময়ের মাঝেই কিউবার তায়নো এবং সিবানো আদিবাসীগোষ্ঠীকে জাতিগত নির্মূল করা হয়। অস্ত্র এবং ব্যাধি নিয়ে। সেই আদিবাসীগোষ্ঠীর বেঁচে যাওয়া গুটিকয়েক ব্যক্তিদেব বংশধর ছিলেন ক্যাস্ট্রোর মা। তাই ক্যাস্ট্রোর শৈশব থেকেই মাতৃভূমিকে দেখেছেন, অনুভব করেছেন, ভিন্নচোখে। ক্যাস্ট্রোর কাছে বিপ্লবের প্রথম এবং প্রধান আদর্শ ছিলেন হোসে মার্তি। যিনি স্পেনিয়ার্ড দখলকারদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে কিউবার প্রথম শহীদ নেতৃত্বদানকারী। মার্তির মৃত্যুর ৭ বছর পর কিউবা থেকে স্পেনের দখলমুক্ত হয়। পায় নতুন মনিব, যুক্তরাষ্ট্র। পুতুল সরকার বসিয়ে প্রতিনিয়ত দাস কিউবাকে শোষণ করায় নতুন মনিব যেন ছাড়িয়ে যাচ্ছিলো সাবেক স্পেনকেও। উল্লেখ্য, পঞ্চাশ দশকে কিউবার আখ খামারের ৪০ ভাগ ছিল আমেরিকার কোম্পানির অধীনে, যে খনিজ ছিল তার ৯০ ভাগও ছিল

ওদের হাতে। দেশটির ৮০ ভাগ তেলও নিয়ন্ত্রণ করতো আমেরিকান স্বত্বাধিকারী। এসব কিছু ক্যাস্ট্রোর পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছিলেন তুলনামূলক সূক্ষ্মতরভাবে। কারণ সমাজের পুঁজিবাদীদের একজন ছিলেন স্বয়ং ক্যাস্ট্রোর স্প্যানিশ বাবা। আদর্শের হাতেখড়ির দিনগুলোতে ক্যাস্ট্রোকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিলো চিবাসের আত্মহত্যা। ক্যাস্ট্রোর পাশে বসেই কিউবান পিপল পার্টির নেতা এডুয়ার্দো চিবাস নিজের মাথায় পিস্তল ধরে গুলি করেন। ক্যাস্ট্রোর চিবাসের জন্য কিছুই করতে পারেননি। তবে পরে পেরেছিলেন সমগ্র কিউবার জন্য। মাত্র ১২০ জন নিয়ে গিয়েছিলেন প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধে। ব্যর্থ হলেও

দ্বিতীয়বার সেই সংখ্যাটি ছিল মাত্র ৮৬। আর প্রতিবার ক্যাস্ট্রো আর যোদ্ধাদের যেন মায়ের মত আগলে রেখেছিল সিয়েরা মিয়েত্রো পাহাড়। চূড়ান্ত যুদ্ধে মাত্র ৩০০ গেরিলা দিয়ে রুখে দিয়েছিলেন ৮০ হাজার সৈন্যের বিশাল বিগ্রেড। ফিদেল ক্যাস্ট্রো এক বিশাল সমুদ্রের নাম। যেন তাঁর উপরে ভেসে ছিল এবং আছে কিউবা নামের দ্বীপটি। মাত্র ৭০ পৃষ্ঠায় সেই সমুদ্রকে তুলে ধরা যায় না। তবে লেখক নিঃসন্দেহে তুলে এনেছেন সময়ের সেরা বিন্দুগুলোকে। এই সমুদ্রের আরও গভীরে যারা গুপ্তধনের অভিযানে যেতে চান তাঁদের জন্য বইটি হতে পারে একটি মানচিত্র।

সাইয়েদুল মুরসালীন

আলোচক: মাসুক আহমেদ

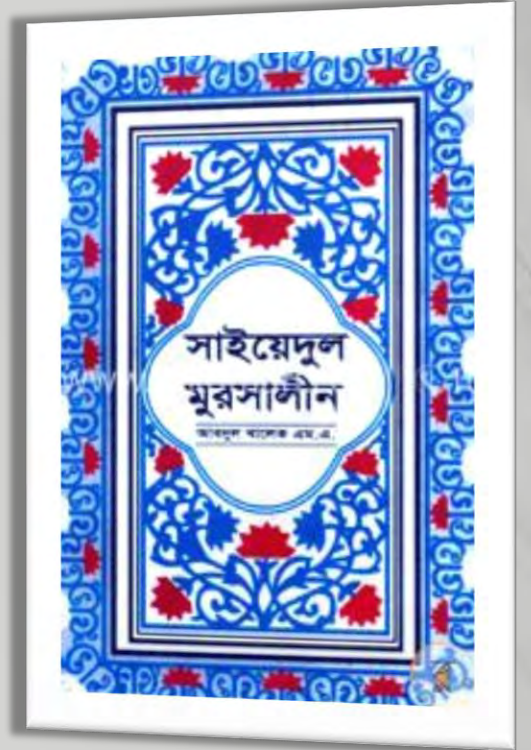
সূচনা: বাংলা ভাষায় সিরাতসাহিত্য চর্চা ঠিক কোন সময় থেকে শুরু হয়েছে তা বলা কঠিন। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় হযরত উমর রা. এর যুগেই আরব মুসলিম বণিকগণ এ দেশে আসেন। ১২০০ খৃস্টাব্দে বখতিয়ার খলজি কর্তৃক রাজা লক্ষন সেনকে পরাজিত করে বাংলার রাজধানী গৌড় অধিকারের পর মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষা বিস্তৃতি লাভ করে।

বাংলা ভাষাকে তিন যুগে ভাগ করা হয়। প্রাচীন যুগ: ১০-১৩ শতাব্দী, মধ্যযুগ: ১৩-১৮ শতাব্দী, আধুনিক যুগ: ১৮-বর্তমান কাল। বিশিষ্ট সিরাত গবেষক নাসির হেলাল তার বাংলা ভাষায় সীরাত বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি বইটিতে মধ্যযুগ থেকে শুরু করে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত ১০২৮টি সীরাত গ্রন্থের সন্ধান দিয়েছেন। ১ গ্রন্থটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে ২০০৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুমান প্রবন্ধে গ্রন্থালোচনা; অধ্যাপক আবদুল খালেক (রহ.) প্রণীত বাংলা ভাষায় লিখিত তিন খণ্ডে সমাপ্ত অনবদ্য ও কালজয়ী নবীজীবনচরিত সাইয়েদুল মুরসালীন।

লেখক পরিচিতি

আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ও বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন অধ্যাপক আবদুল খালেক সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার দুই ধারাতেই সর্বোচ্চ পর্যায়ে কৃতিত্বের সাথে শিক্ষাজীবন শেষ করেন। তিনি আরবী ও ফার্সী ভাষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে ডবল এম.এ সম্পন্ন করে ব্রিটিশ সরকারের

পক্ষ থেকে মেধার স্বীকৃতিস্বরূপ পাঁচ ভরি ওজনের



স্বর্ণপদকও লাভ করেন।

কর্মজীবনে তিনি ফেনী সরকারী কলেজ ও অখণ্ড ভারতের কলকাতার প্রখ্যাত প্রেসিডেন্সী কলেজে (বর্তমান প্রেসিডেন্সী বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যাপনা করেন এবং লেডী ব্রুবোর্ন কলেজে ও ঢাকায় সরকারী ইডেন কলেজে ভাইস প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

দেশ বিভাগের পর তিনি পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের জন্য সরকারীভাবে গঠিত 'তা'লীমাত্বে ইসলামিয়া বোর্ডে' সম্মানিত সদস্য হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৯৫৪ সালে তিনি

তৎকালীন পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ সালে তিনি ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর মাজার শরীফ ছতুরা শরীফ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় অবস্থিত।

অধ্যাপক আবদুল খালেক বিশিষ্ট সুফি ফুরফুরা শরীফের খলিফা ছদর উদ্দিন আহমদ (রহ.) ও ফুরফুরা শরীফের মুজাদ্দের জামান পীর আবু বকর সিদ্দিকী (রহ.) উভয় থেকে কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দীয়া, মুজাদ্দেরিয়া, মুহাম্মাদীয়া তরীকার তালিম, তায়াজ্জুহ ও খেলাফতপ্রাপ্ত। তাঁর পীরভাইদের মধ্যে মাওলানা রুহুল আমীন বশীরহাটি, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ছারসিনার নেসার উদ্দিন আহমদ প্রমুখ ও সান্নিধ্যপ্রাপ্ত খলিফাদের মধ্যে ফরায়ীকান্দী উয়েসীয়া শরীফের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব সুফি শায়খ বোরহানুদ্দীন উয়েসী ও বিশিষ্ট মুরিদ মুসলিম রেনেসাঁর কবি, ফররুখ আহমদ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

অধ্যাপক আবদুল খালেক (রহ.) এর চিন্তা ও লেখনীতে মুজাদ্দের আলফে সানী (রহ.), শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দের দেলহভী (রহ.) ও সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (রহ.) এর প্রভাব প্রবলভাবে পরিলক্ষিত।

অধ্যাপক আবদুল খালেক স্বরচিত গ্রন্থগুলো হলো: সাইয়েদুল মুরসালীন (তিন খণ্ড), সেরাজুস সালেকীন ও বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফতহুল বারী রচয়িতা হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানীর (রহ.) এর লিখিত গ্রন্থ মুনাব্বহাতের বাংলা অনুবাদ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তাঁর রচিত গুনচা-ই-ফারসী প্রথম খণ্ড, দুররাতুল আদাব ২য় খণ্ড, সহজ আরবী ব্যাকরণ মাদ্রাসার বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যসূত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলো।^২

সাইয়েদুল মুরসালীন : সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য
এই অদ্বিতীয় গ্রন্থটির (দুই খণ্ড) প্রথম প্রকাশকাল ১৯৫১; দ্বিতীয় ও পরিবর্ধিত সংস্করণ বের হয় ১৯৫৯ সালে। তৃতীয় খণ্ডটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০৭ সালে। তিনখণ্ড মিলিয়ে মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৭০। ২০১৬ সাল পর্যন্ত মোট দশবার পুনর্মুদ্রণ হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে মোট চারবার প্রকাশ হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে গ্রন্থটি সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক তথ্যবহুল এবং বাংলা ভাষায় কোন আলেম কর্তৃক রচিত প্রথম নবী-জীবনচরিত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে বিভিন্ন ধর্মানুসারীদের নিজ নিজ ধর্মের বিকৃতি সাধনের স্বরূপ, তৎকালীন হিন্দুস্তান, চীন ও আরবের ভৌগোলিক অবস্থা, প্রাচীন আরব ও ইসলামপূর্ব আরব জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণপূর্বক লেখক সুচারুভাবে শেখনবী মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের গভীর, ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলমে আরওয়াহ'র জিন্দেগী থেকে শুরু করে তাঁর মাক্কী জীবন, নবুওয়াতের প্রকাশ, শবে মিরাজ, হিজরত, মদীনার জীবন এবং প্রায় প্রত্যেকটি যুদ্ধের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণসহ হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা দিয়েছেন। জানা যায়, গ্রন্থটির প্রুফ রিডার হিসেবে অধ্যাপক সাহেবের মুরিদ, কবি ফররুখ আহমদ ভাষাশৈলী ও সৌন্দর্যবর্ধনে ভূমিকা রেখেছেন।^৩

এই গ্রন্থের প্রধান অবলম্বন ছিল ইমাম আলী বিন বুরহানুদ্দিন হালাবী'র সীরাত-ই-হালাবী নামক গ্রন্থ। সীরাতে হালাবী ব্যতীত নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ থেকে আলোচিত হয়েছে:

১. সীরাতে ইবনে হিশাম : আবু মুহাম্মদ আব্দুল মালিক বিন হিশাম।
২. মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া : ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর বিন খতিব কাসতালানী।
৩. যাদুল-মা'আদ : ইমাম আবু আব্দুল্লাহ বিন কাযয়েম জাওমী।
৪. রাওজুল উনফ : ইমাম সোহাইলী।
৫. খাসায়য়েসে কুবরা : ইমাম জালালউদ্দীন সুয়ুতী।
৬. সীরাতুলনবী : শিবলী নোমানী ও সুলায়মান নদবী।
৭. আসাহচ্ছিয়ার : মাওলানা আব্দুর রউফ দানাপুরী।
৮. হাযরাতে মোহাম্মদ (সঃ) : মোহাম্মদ হোসাইন হাইকেল (মিশর)।
৯. মিশকাতুল মাসাবীহ ও অপরাপর হাদিস গ্রন্থ।
১০. বয়ানুল কুরআন, তাফসীরে আযিযী ও অন্যান্য তাফসীর।
১১. শাযারাতুল কওম : শেখ আকবর ইমাম মহীউদ্দিন ইবনুল আরাবী।
১২. মাকতুবাৎ : হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী।

গ্রন্থের শুরুতেই লেখক নিজেই গ্রন্থ লেখার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। অধ্যাপক আবদুল খালেক বলেন: “সাইয়েদুল মুরসালীন, সারওয়ারে কায়িনাত হযরত আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরত লেখার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মূল হইতেছে বুয়ুর্গানে দ্বীন ও আয়েম্মা-ই-শারয়ে মতীনের ন্যায় নিজেসে সারওয়ারে কায়িনাত (সঃ)-এর খিদমতে নিয়োজিত রাখা, ঈমান সতেজ ও সরস করা, তাঁহার ফয়েজ ও দোয়া লাভ করা এবং সায়াদাত-ই-দারাইন হাসিল করা। এই জন্য এই কিতাবে তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করার প্রয়াস পাইয়াছি যাতে আল্লাহ পাক পরোয়ারদিগারের দরবারে কবুলিয়তের দরজা

লাভ করে ও রহমত এর কারণ হয়। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অজ্ঞতা ও জড়বাদের ভাবধারায় প্রভাবান্বিত প্রচারণার ফলে তাওহীদ, ইসলাম, কুরআন, হাদীস ও সারওয়ার কায়িনাত (সঃ) সম্বন্ধে সমাজে যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে, এই কিতাবে তাহা অপনোদন করাও অন্যতম উদ্দেশ্য।”

গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য থেকে কিছু অংশ নিম্নরূপ: “মূলত এই গ্রন্থে আমরা সাধারণভাবে মশহুর ঘটনাবলীর কিছু বা কোন দিকই বাকি রাখি নাই। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনীকে সাজাইতে হইবে রিসালাতের পটভূমিতে। যে সমস্ত ঘটনা ও কার্য প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে ঐ সমস্তকে বিচার বা গোপন করিবার অধিকার মানুষের নাই। তাঁহাদের সর্ব কাজ ও আদেশ আল্লাহর আদেশ ও নির্দেশে হইয়া থাকে। ঐ সমস্তই ঈমান ও ইসলামের ভিত্তি; কাজেই সমালোচনার অতীত। তাই কুরআনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ ও অনুকরণ করতে বলা হইয়াছে, সমালোচনা ও বিচার করিয়া সত্যের অপলাপ করিতে নহে। আধুনিক লেখকদের অধিকাংশই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী রিসালাতের পটভূমি হইতে বহু দূরে সরাইয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাকে রসূল হিসাবে দেখান নাই দেখাইয়াছেন রিফর্মার সংস্কারক, ভাববাদী অতিমানব হিসাবে। এখানেই সত্যের অপলাপ করা হইয়াছে। রিসালাত প্রমাণ করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে মুযিজা। ইহা রিসালাতের মেরুদণ্ড। মেরুদণ্ড ব্যতীত দেহ যেরূপ দাঁড়াইতে পারে না, মুযিজা ছাড়াও পার্থিবলোকে রিসালাতের সত্যতা প্রমাণিত হইতে পারে না। নবীগণ আল্লাহ প্রেরিত পুরুষ, তাদের এই দাবির সত্যতা প্রমাণ কল্পে কাফিররা জ্বলন্ত নিদর্শন প্রদর্শনের দাবী করিত। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁহাদিগকে অলৌকিক ঘটনাবলী দ্বারা সাহায্য

করিতেন। ঐ সমস্ত ঘটনা দ্বারা একদিকে যেমন অকাট্যভাবে তাঁহাদের দাবির সত্যতা প্রমাণিত হইত, অপরদিকে তেমনি তাওহীদের নিদর্শনও প্রকাশ হইয়া পড়িত। রিসালাতের দাবীর সহিত নবীগণের নিকট হইতে তাওহীদের নিদর্শন রূপে যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনা প্রকাশিত হয় তাহাই মুযিজা অপরগুলো নহে। যাঁহারা রিসালাত সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মুযিজা অস্বীকার করেন, তাহারা যে ওই বিষয়ে সামান্যতম জ্ঞানও রাখেন না ইহা তাহারই পরিচায়ক। যাহারা মুযিজা স্বীকার করেন না, তাহারা রিসালাত স্বীকার করেন না, এবং যারা রিসালাত স্বীকার করেন না, তাহারা সন্দেহাতীতভাবে কাফির। কুরআন, মি'রাজ, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া প্রভৃতি মুযিজা। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হস্তিও মুযিজা। যে ব্যক্তি কুরআনের এক অংশ মানে, অপর অংশ মানে না সেও কাফির। আমরা এই গ্রন্থে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মশহুর মুযিজাগুলি সমস্তই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। হাদিস ও কোরআনের বর্ণিত অসংখ্য মুযিজার কয়টি তাহারা অস্বীকার করিবেন? ...এই গ্রন্থে বহু ঘটনা ও মুযিজা লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং তাহা হাদিস ও সীরাত গ্রন্থ হইতেই করা হইয়াছে। তের শত বৎসর পর অভিনব কিছু ইহাতে স্থান পায় নাই।

আমরা এই গ্রন্থে কোন একজন নির্দিষ্ট লেখকের কোন একটি খামখেয়ালি অভিমত লইয়া অযথা কাগজ অথবা সময় নষ্ট করি নাই; আমরা ঘটনাবলী পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি। সত্যমিথ্যা আপনাতেই প্রকাশ হইয়া পড়িবে এবং তাহারাও সহজে বিচার করিতে সমর্থ হইবেন। আমরা শরহে-সদর, শককে সদর, মি'রাজ, মুযিজা প্রভৃতি বিষয়ে অপরূপ কৌশলী লেখকদের বিক্ষিপ্ত মূল্যহীন মন্তব্য করিয়া অজ্ঞ ও অশিক্ষিত লোকদিগকে ইসলাম ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিতে

প্রয়াস পাই নাই; সেইগুলি কুরআন ও হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে এবং মুহাদ্দিস ও ইমামগণের পদাঙ্কানুসরণে সকলের সম্মুখে হাজির করিয়াছি। ৪

বিশিষ্টজনের মূল্যায়ন

অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান ও মোহাম্মাদ আব্দুল হাই: “মাওলানা আবদুল খালেক এম, এ রচিত ছাইয়েদুল মুরসালিন অধুনা প্রকাশিত জীবনী গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এ বিরাট গ্রন্থটি রচনায় লেখকের শ্রমশীলতা ও হযরতের প্রতি অকৃত্রিম হৃদয়ানুরাগ লক্ষ্য করার মতো।” ৫

বিশিষ্ট সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান: “এই প্রসঙ্গে সর্বশেষ যে গ্রন্থটির কথা উল্লেখ করব তার নাম হচ্ছে ছাইয়েদুল মুরলীন। গ্রন্থটির লেখক মাওলানা আবদুল খালেক। গ্রন্থটি দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সালে। দুই খণ্ড মিলে গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮০৮। বাংলাভাষায় এটিই রাসূলের সর্ববৃহৎ জীবনী। এ পর্যন্ত বাংলাভাষায় প্রকাশিত রাসূলের জীবনী গ্রন্থগুলোর মধ্যে মাওলানা আবদুল খালেকের গ্রন্থটি সর্বাপেক্ষা তথ্যবহুল এবং যতটা সম্ভব তিনি রাসূলের জীবনের প্রধান প্রধান সবকটি ঘটনাকেই উল্লেখ করবার চেষ্টা করেছেন। মুদ্রণ বিভ্রাটের জন্য এবং ভাষার জটিলতার জন্য গ্রন্থটি পাঠে কিছুটা অসুবিধা হলেও তথ্যাদির দিক থেকে এই গ্রন্থটি সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য।”

সব্যসাচী লেখক আবদুল মান্নান সৈয়দ: “বাংলা ভাষায় রচিত একটি শ্রেষ্ঠ রসূল-চরিত মাওলানা আবদুল খালেকের সাইয়েদুল মুরসালীন।” ৬

নাসির আল হেলাল সূত্রে মাহদী হাসান: “বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মরহুম মাওলানা আবদুল খালেক রচিত সাইয়েদুল মুরসালীন (দু’খণ্ড) বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সংযোজন। মোস্তফা চরিত, বিশ্বনবী পর্যায়ের গ্রন্থ এটি না হলেও জনপ্রিয়তার দিক থেকে অনেকটা কাছাকাছি। এ গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে। এরপর ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থটির ৪টি সংস্করণ প্রকাশ করেছে। দু’খণ্ডে প্রায় হাজার পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি লেখকের কঠোর পরিশ্রমের ফসল। ...। উল্লেখ্য যে, এটিই ছিল প্রথম কোন আলেম রচিত সিরাতগ্রন্থ।”৭

মুহাইমিনুল ইসলাম মঈন: “মাওলানা আব্দুল খালেক রচনা করেন বাংলাভাষায় সর্ববৃহৎ এবং সর্বাপেক্ষা তথ্যবহুল ৮০৮ পৃষ্ঠার দুই খণ্ডের গ্রন্থ ছাইয়েদুল মুরছালীন, যা ১৯৫১ সালে প্রকাশিত হয়।”৮

বিশিষ্ট লেখক ও সিরাত গবেষক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান: “আমার জানামতে বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত প্রকাশিত সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য সিরাত গ্রন্থ মরহুম অধ্যাপক আবদুল খালেক কৃত সাইয়েদুল মুরসালীন নামক বইটি। এটা দু’খণ্ডে সমাপ্ত। ...শিবলী নো’মানীর সীরাতুন নবী, সৈয়দ সুলায়মান নদভীর খুতবাতে মাদরাজ, সুলায়মান সালমান মনসুরপুরীর রাহমাতুল্লিল আলামীন, মুহাদ্দেস ইদরীস কান্দলভীর সীরাতে মোস্তফা, মানাজের আহসান গিলানীর রহমাতুল্লিল আলামীন, আব্দুর রউফ দানাপুরীর আসাহহুস সিয়র প্রভৃতি আমাদের বিবেচনায় সর্বোৎকৃষ্ট। এগুলোর মধ্যে সীরাতুন নবী গ্রন্থের মোট ছয় খণ্ডের মধ্যে তিন খণ্ডের বাংলা তরজমা প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় মৌলিক রচনার মধ্যে অধ্যাপক আব্দুল খালেকের সাইয়েদুল মুরসালীন, অধ্যাপক শিশির দাসের প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও গোলাম মোস্তফার বিশ্বনবী সর্বোৎকৃষ্ট বলে আমার ধারণা।”৯

তথ্যসূত্র:

১. ক. বাংলা ভাষায় রচিত সিরাতগ্রন্থের তালিকা নিয়ে বই - মাওলানা সাখাওয়াত উল্লাহ
খ. সীরাত চর্চার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, হাফেজ ফজলুল হক শাহ, দৈনিক ইনকিলাব,
১৯ ডিসেম্বর, ২০১৯
২. ক. হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (রহ.) এর বিস্তারিত জীবনী - রুহুল আমিন বশীরহাটি
খ. হযরত শাহ সূফী অধ্যাপক আবদুল খালেক (র.) - সিদ্দিক আহমদ খান
গ. ইসলাম প্রসঙ্গ - ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ
ঘ. ফুরফুরা শরীফের ইতিবৃত্ত - মুবারক আলী রহমানী
ঙ. হাদীয়াতুছ সালেকীন - বোরহানুদ্দীন (বি. এ)
চ. পীর প্রফেসর আব্দুল খালেক ছতুরাভী (র.) জীবন ও কর্ম - মাসুক আহমেদ
ছ. ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার ইতিবৃত্ত - শোয়েব চৌধুরী সম্পাদিত
৩. কবি ফররুখ আহমদ ব্যক্তি ও কবি - শাহাবুদ্দিন আহমদ সম্পাদিত
৪. সাইয়েদুল মুরসালীন - আব্দুল খালেক (এম. এ), অবতরণিকা, পৃ: ১৮-২২

৫. ক. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১৯৫৬), অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান ও মোহাম্মাদ আব্দুল হাই, ৭ম সংস্করণ পৃ. ১২১
খ. ফুরফুরার ইতিহাস : আবদুল্লাহ আল আরিফ সম্পাদিত(২০০৫) পৃ. ২০৯-২১১
৬. বাংলা সাহিত্যে মুসলমান : আবদুল মান্নান সৈয়দ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৮ (চতুর্থ মুদ্রণ), ১৯১ পৃষ্ঠা
৭. ক. বাংলা ভাষায় সীরাত বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি - নাসির হেলাল, ইসলামিক ফাউন্ডেশন (১৯৯৩)
খ. বাংলা ভাষায় রচিত ও অনূদিত পূর্ণাঙ্গ সীরাত সমূহ পরিচিতি ও পর্যালোচনা- মাহদী হাসান
৮. বাংলা ভাষায় হযরত মুহাম্মদ (স) এর জীবনী : মুহাইমিনুল ইসলাম মঙ্গল
৯. প্রিয় নবীজীর (সা:) প্রিয় প্রসঙ্গ, সম্পাদনায় : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মদীনা পাবলিকেশন, পৃ. ২০৭-৮

লেখক: সম্পাদক, ত্রৈমাসিক প্রত্যুষ

মাধুডাঙাতিরে : হাসান রোবায়ত

ঐতিহ্য, ২০২০

আলোচক: মুহাম্মদ আবু সাঈদ



ব্যক্তিগত অনুভূতি দ্বারা সমালোচনা শুরু করাটা মহত্বের আলামত বলে জানি। কারণ, একজন সমালোচকের ব্যক্তিক অনুভূতির পথ ধরেই সমালোচনার রাস্তা আগায়।

কিছুদিন আগেও বর্তমান মানে জীবিত কবিদের কবিতা খুব একটা পড়তাম না, যদিও বা প্রবন্ধমাত্রই অজ্ঞান! বই পড়ার তুলনায় জীবিত কবিদের কবিতার বই শতে এক ভাগও হবে না, নিঃসন্দেহে। কিন্তু, হাসান রোবায়তের কবিতা

পড়ার পর একটা পরিবর্তন আসলো। একজন কাঠখোঁটামার্কী পাঠককে কবিতায় নিবিষ্ট করে রাখার জন্য যত উপাদান দরকার তার সবকিছু আছে হাসানের কবিতায়।

২০১৬-১৭ সালে রচিত ৩৯টি কবিতার সমাবেশ ঘটেছে মাধুডাঙাতিরেতে। এ কাব্যগ্রন্থের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, প্রথমেই পাঠককে মায়াজালে আঁটকে ফেলবে। প্রথম কবিতার শেষে যখন আপনি উচ্চারণ করবেন: আমি কি আমি-ই নাকি পর / একতারে লুকানো ডাঙ্ক! / অনর্থে প্রিয় কোনো সুরে / বেজে যায় আমাদের মুখ- তখন একটা নিবিড় ঘোরলাগা কাজ করবে অবশ্যই। এই ঘোরলাগা আস্তে আস্তে চেনাবে মাধুডাঙাতিরের জনপদ।

‘তোমার মুখের থেকে বেশি / মহাকাল নাই পৃথিবীতে’র মতো উচ্চারণে যখন অতল প্রেমের সজল অভিব্যক্তি নিয়ে ভাবতে মন টানবে ঠিক তখনই ‘ভাষার অধিক স্বীয় ভূমি / কখনো কি ছিল আমাদের-!’ উচ্চারণ আপনাকে ভাষার দার্শনিক কূপে ফেলে দেবে। পুরো কাব্যগ্রন্থজুড়েই ভাষার দার্শনিক ব্যাপার খানিক পরপর এসেছে। কিছু উদ্ধৃতির লোভ সামলানো দায়:

কী যেন বলার ছিল, ভাবি
ফিরে এসে আমি পুনরায়
ভাষার চূড়ায় বসে পাখি
সারাদিন ধূলা ঝেড়ে যায়-

(১২ পৃষ্ঠা)

তবুও দূরের আলো আসে
সন্ধ্যা ও নিভৃতির নিচে
বহমান আমি ক্ষণকাল
জননীর চেনা দহলিজে-

(১৫ পৃষ্ঠা)

ভাষার বাইরে সবই ফাঁকা
সন্দেহ, দ্বিধা নিরুপায়
মানুষের ঘর ফাঁকা হলে
হাওয়ায় সেসব রটে যায়-

(২৩ পৃষ্ঠা)

ঋতুর ওপারে নদীতীর
চল দেয় কী গভীর পাশা!
নিখিল তোমাকে ভেবে যাই
বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ভাষা

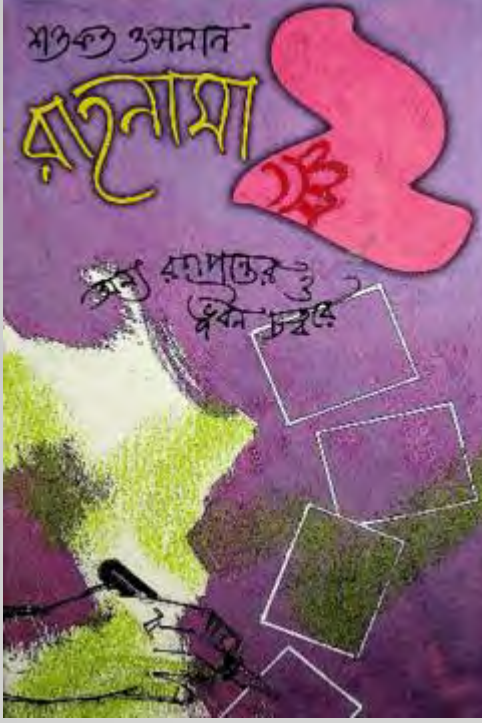
(২৬ পৃষ্ঠা)

ভাষার ব্যাপারে এমন দার্শনিক জটিলার ভাবনাগুলো
কবিতায় একেবারে 'শিমুলের তুলা'র মতো তুলতুলে
ভঙিমায় নিয়ে আসা তাঁর পক্ষেই সম্ভব, যিনি সহজাত কবি।

তাক লাগানোর মতো, শরীরে ঝিম সৃষ্টি করার মতো, হঠাৎ
দাঁড়িয়ে ভাবনার জগতে ডুব দেয়ার মতো স্তবক আছে
যথেষ্ট, কিন্তু মাধুড়াঙাতীরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এখানে মুদ্রিত
নয়। তাহলে কোথায়? যেখানে কবি কাব্যকে দাঁতভাঙা
শব্দের শব কিংবা পাণ্ডিত্যের পোশাক পড়ানোর হাঙ্গামায়
লিপ্ত নেই- কোনোদিন কবিতা পড়েনি এবং কবিতার
শ্রেষ্ঠতম পাঠক উভয়কেই হঠাৎ পড়া শীতে ঠোঁটের চামড়ার
মতো টানতে সক্ষম এই কাব্যগ্রন্থ। এবং আমি মনে করি,
মাধুড়াঙাতীরের প্রধান বৈশিষ্ট্য এখানে কেবল মুদ্রিত নয়,
খোদিতও।

বঙ্কিমীয় কিংবা মান্নান সৈয়দীয় প্রবন্ধের ঘানি টানতে টানতে
যখন সরলতার আশ্রয় খুঁজি তখন আমাকে হাসান রোবায়তে
আশ্রয় দেবেন তাঁর মাধুড়াঙাতীরে ভ্রমণের আহ্বানে;
কতদিন? আমরণ।

কালোতর্পণ



শওকত ওসমান

সংবাদপত্র জনমত গঠনের একটি প্রকৃষ্ট বাহন। এই বাহন আবার প্রচণ্ড ধ্বংসমুখর উপাদান রূপে দেখা দিতে পারে। সংবাদপত্র তো বর্তমানে রাজনৈতিক ভাবাদর্শের সহযাত্রী। উদারতাবাদের কোনো জায়গা আছে বলে মনে হয় না।

রাহনামা দ্বিতীয় খণ্ড : শওকত ওসমান, সময় প্রকাশন, ২০০৭, ২৩৯ পৃষ্ঠা



খান বাহাদুর আহছানউল্লাহ

কেবল অর্থকরী বিদ্যা দ্বারা জীবন-সমস্যার সমাধান হয় না। আধ্যাত্মিক শিক্ষার আবশ্যিক। কেবল অর্থ মানুষকে উন্নত করিতে পারে না। আত্মার উন্নতিই প্রকৃত উন্নতি। মানবতাই জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পাইতেছে বহু লোক, কিন্তু মানুষ তৈরী হইতেছে কয়টী? মানসিক শিক্ষার সহিত আধ্যাত্মিক শিক্ষারও আবশ্যিক। শরীর, মন ও আত্মা লইয়া মানুষ গঠিত। শরীরের জন্য ব্যায়াম আবশ্যিক, আর আত্মার জন্য আধ্যাত্মিক শিক্ষার আবশ্যিক। শরীরের আয়ু সীমাবদ্ধ, কিন্তু আত্মার মৃত্যু নাই। শাস্ত্রত কাল যে আত্মার প্রসার, তার শিক্ষার জন্য আমরা একদম উদাসীন। যে শিক্ষা দ্বারা শরীর মন পুষ্ট হয়, সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা।

আমার জীবন-ধারা : খান বাহাদুর আহছানউল্লাহ, আহছানিয়া মিশন পাবলিকেশন ট্রাস্ট, ২০০০, ৯৭-৮ পৃষ্ঠা

শ্রদ্ধা ও স্মরণ

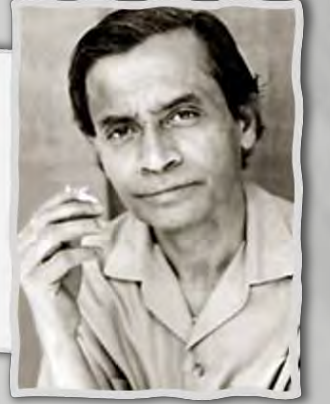
আল মাহমুদ

বুদ্ধদেব বসু আমাদের জীবনে এক মহান সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সম্ভবত বুদ্ধদেব না থাকলে আধুনিক বাংলা কবিতা আন্দোলন কবিদের মধ্যে অতটা জনপ্রিয় হতো না। তাছাড়া তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার ও কবিতা বিষয়ে সবসময় সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ। বুদ্ধদেব তখন যাদের কবি বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন পরবর্তীতে তাঁদের সবাই কবি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। বুদ্ধদেব ফরাসি কবি শার্ল বোদলেয়ার-এর অনুবাদ করে তৎকালীন আধুনিক বাংলা কবিতার দিকদর্শন বদলে দিয়েছিলেন। তিনি বোদলেয়ারকে অনুবাদ করেছিলেন ছন্দে, গন্ধে, স্পর্শকাতরতার অসাধারণ আকর্ষণ তৈরি করে। ফলে তৎকালীন বাংলা ভাষার তরুণ কবিরা প্রায় সকলেই ইউরোপীয় কবিতার সামগ্রিক আকর্ষণ অন্তত একবার হৃদয়ে অনুভব করেছিলেন। বুদ্ধদেব না থাকলে কবিতার আধুনিকতার উপাদান যে এমন বৈচিত্র্যময় হতে পারে তা সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারতাম না। তিনি ছিলেন আধুনিক বাংলা কবিতার মহানায়ক।

উত্তরাধিকার বুদ্ধদেব বসু জন্মশতবর্ষ সংখ্যা : বাংলা একাডেমি, ২০০৮, ৬৬-৭ পৃষ্ঠা

আগামী ৩০ নভেম্বর

কবি ও সাহিত্যিক
বুদ্ধদেব বসুর
১১২ তম মৃত্যুবার্ষিকী



বিজয়া মুখোপাধ্যায়:

বুদ্ধদেবের বিদেশী সাহিত্য-প্ৰীতি তাঁকে স্বদেশী পণ্ডিত ও গবেষকের কাছ থেকে দূরে রেখেছিল একথা সম্ভবত সত্য। তাঁর মৃত্যুর পরে এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে কেউ বলেছেন, যে সময়ে তিনি ঘরে ফিরে আসছিলেন- মহাভারতচর্চা তাঁর 'হোম কামিং বয়েজ'- সে সময়েই এমন হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হল। একথারও যথার্থতা হয়তো অনস্বীকার্য। কিন্তু এও ঠিক বুদ্ধদেব বসু খুব দেরিতে শুরু করে যে মহাভারতচর্চা করে গেলেন, তার গুণগত উৎকর্ষ জীবনব্যাপী গবেষককেও নতশির করবে।

উত্তরাধিকার বুদ্ধদেব বসু জন্মশতবর্ষ সংখ্যা : বাংলা একাডেমি, ২০০৮, ৪৮৪ পৃষ্ঠা

সিকদার আমিনুল হক:

একজন কবির কাছে আমাদের ঋণ প্রধানত কবিতার জন্য- কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো কবির কাছে এই ঋণ বিচিত্র ও কোনো কোনো অর্থে পরস্পরবিরোধী। তবু রবীন্দ্রনাথ দেবতার মতোই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন- দাতা হিসেবে তাঁর অনন্যতার দ্বিতীয় উদাহরণ নেই; কিন্তু সমকক্ষ প্রতিভা না হলেও এক বিপুল দায়িত্বকেই বহন করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু- এবং রবীন্দ্রনাথের পর রবীন্দ্রনাথের মতো সাহিত্যে ‘আবৃত’ হবার একটি বিরল উদাহরণ হিসেবে তাকে প্রণতি জানাবে সুবিবেচক ভাবীকাল।

উত্তরাধিকার বুদ্ধদেব বসু জন্মশতবর্ষ সংখ্যা : বাংলা একাডেমি, ২০০৮, ৫৪৪ পৃষ্ঠা

শ্রদ্ধা ও স্মরণ

আগামী ৩ ডিসেম্বর

বাংলা সাহিত্যিক
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
৬৪ তম মৃত্যুবার্ষিকী



প্রতিভা বসু:

কবিতা ভবন থেকে
'এক পয়সায় একটি

সিরিজ' যখন বেরুলো তখন সেই সিরিজের কবিতার সম্পাদক হলেন বুদ্ধদেব বসু, গল্পের সম্পাদক হলাম আমি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এসে আমাকে বললেন, 'তাই নাকি? তবে তো আপনার সম্পাদনায় আমার গল্পই প্রথমে যাওয়া উচিত।' তাই হলো, কয়েকদিনের মধ্যেই গল্প নিয়ে এসে হাজির। আমরা ঠিক করেছিলাম সাধ্যমতো প্রত্যেক লেখককেই টাকা দেবো। টাকা ছাড়া গল্প চাওয়া বা পাওয়া দুটোই দুঃসাধ্য। তখনকার দিনের সব বিখ্যাত লেখকই লিখেছিলেন সেই সিরিজে, টাকাও নিয়েছিলেন। কিন্তু মানিকবাবুকে দেওয়া গেল না। মোটা কাচের চশমার ফাঁকে তাঁর সেই দুই উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি প্রজ্জ্বলিত করে আমাকে ভস্ম করে দিয়ে বললেন, 'লেখা আমি স্বেচ্ছায় দিয়েছি, টাকার জন্যে দিইনি।' মানুষটা কিছু অদ্ভুত ছিলেন। অদ্ভুত এবং অদম্য। এই ধরনের চরিত্র গল্প উপন্যাসে পাওয়া যায়। বাস্তবজীবনে আমাদের কাছে মানিকবাবুর তুলনা মানিকবাবুই। স্পষ্টবাদিতায় তিনি দ্বিতীয়রহিত, কটকাপট্যের ধার ধারেন না, এমনকি মনের গোপন কথা অনায়াসে উচ্চারণ করতেও দ্বিধাহীন।

জীবনের জলছবি : প্রতিভা বসু, আনন্দ পাবলিশার্স, নবম মুদ্রণ ১৪১৮, ১৫১ পৃষ্ঠা

জাকির তালুকদার:

তাত্ত্বিকভাবে যা করা সম্ভব হয়নি, সৃজনশীল সাহিত্যে সেটাই করে দেখিয়েছেন

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মননের এমন জগ্গমতা নিয়ে আর কয়জন লেখক বিচরণ করেছেন বাংলা সাহিত্যে! অথচ সেদিকটি উপেক্ষা করে বারবার আলোচনায় এসেছেন ব্যক্তি মানিক, কমিউনিস্ট মানিক, স্বেচ্ছায় দারিদ্র বরণ করে নেওয়া মানিক (এটি একটি বানানো উপকথা। স্বেচ্ছায় কেউ কখনো দারিদ্র্য বরণ করে নেয় না), প্রতিনিয়ত জীবনের হলাহল পানকারী মানিক, বিশাল শরীর নিয়ে প্রায় আকাশ ঢেকে ফেলার মতো বাঙালি সমাজে বেমানান উচ্চতার মানিক, এমনকি জীবনের বোঝা বইতে বইতে ক্লান্ত হয়ে পড়া মা কালীর শরণ নেওয়া মানিক। সমকালীন লেখকসঙ্গীরা কেউ ছিলেন তাঁর গুণমুগ্ধ, কেউ ছিলেন প্রবল বিরোধী। তাই তাদের স্মৃতিচারণায়-মূল্যায়নে উচ্ছ্বাস যেমন থাকবে, প্রতিকূল মর্মভেদী মন্তব্যও তেমনই থাকবে বলে ধরে নেওয়াই স্বাভাবিক। সঠিক মানিককে তুলে আনার দায় যাদের ছিল এবং আছে, তাঁরা সেই কাজের জন্য কতটুকু প্রস্তুতি নিয়েছেন, মানিক-বিষয়ক বড়-ছোট-টাউস-পাতলা নানারকম গ্রন্থ ও অভিসন্দর্ভ পাঠের পড়ে সেই প্রশ্ন তোলাটা শুধু সঙ্গতই নয়, এক ধরনের নৈতিক দায়িত্ব হয়েও দাঁড়িয়েছে।

উত্তরাধিকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ সংখ্যা : বাংলা একাডেমি, ২০০৮, ৮৮ পৃষ্ঠা

শ্রদ্ধা ও স্মরণ

আগামী ২৭ নভেম্বর

শহীদ বুদ্ধিজীবী
মুনীর চৌধুরীর
৯৫তম জন্মবার্ষিকী



আগামী ১৪ ডিসেম্বর

৫০তম মৃত্যুবার্ষিকী

অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক

আমি (আহমদ ছফা) প্রশ্ন করলাম, স্যার আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক দিন ছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার সঙ্গে এমন কারোর পরিচয় হয়েছিল কি না, যার স্মৃতি যতোদিন বেঁচে থাকবেন অনুরাগ সহকারে লালন করবেন? স্যার বললেন, আমি মুনীরের নাম কمو।

আমি অধিকতর নিশ্চিত হওয়ার জন্য বললাম, আপনি কি মুনীর চৌধুরী সাহেবের কথা বলছেন?

স্যার বললেন, হ, মুনীরের মতো মানুষ আমি খুব কমই দেখি। তার মধ্যে হিংসা বিদ্বেষের কোনো লেশ কোনোদিন দেখি নাই। অত্যন্ত উচ্চ মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ আছিল মুনীর।

আমি স্যারের চোখমুখের দিকে তাকালাম। তাঁর চোখের কোনায় পানি চিকচিক করছে। কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না।...

যদ্যপি আমার গুরু : আহমদ ছফা, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০
(তৃতীয় মুদ্রণ), ১০৩ পৃষ্ঠা

সরদার ফজলুল করিম

মুনীরের একটা পরিষ্কার পোট্রেট আমাদের সামনে থাকা দরকার। মুনীর ছিল একটা সাংঘাতিক হিউমারিস্ট। আমাদের সঙ্গে যেমন, তেমনি নিজের পরিবারের মধ্যেও। খুব রসিক লোক ছিল সে। আমাদের সঙ্গে যেভাবে কথা বলত বাপ-মা'র সাথেও ঠিক সেভাবে মজা করে কথা বলত। মুনীর ছিল মাস্টার স্পিকার, মাস্টার ডিবেটর। ফজলুল হক হল, ঢাকা হল, জগন্নাথ হল এবং সলিমুল্লাহ হল- এই চারটা হলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে মুনীর জড়িত থাকত। যে কোনো সাহিত্যিক ডিবেটে মুনীর একেবারে মাস্টার। ওর একটা সাইকেল ছিল। যদি একই দিনে তিনটা হলে ডিবেট থাকত তবে একটা হলে ডিবেট উইন করে আর একটা হলে যেত। আমরা সচেতনভাবে ভালোবাসতাম তাকে। মুনীরের একটা বাক্য আছে তার আত্মজীবনীতে 'আমি যদি সরদারদের না চিনতাম তা হলে আমার জীবন কি হত আমি জানি না।' আমি ব্যক্তিগতভাবে মুনীরের নাম দিয়েছিলাম King of words অর্থাৎ 'শব্দের রাজা'। গোঁড়া মুসলিম ছাত্ররা ওকে কমিউনিস্ট বলে মনে করত। কিন্তু মুনীর ওদের সঙ্গে খুব মজা করত। যদি কখনো কোনো

জঙ্গিবাদী মুসলিম ছাত্র ওকে একটা কথা বলত, মুনির অমনি ঠাট্টা করে তাকে উত্তর দিত, ‘আপনারা যা কইছেন তার উপরে আর কথা হয়?’ তখন ছেলেরা তার কথা বুঝতে না পেরে একে অপরকে জিজ্ঞেস করত, ‘মুনির কি আমাদের পক্ষে কইল, না বিপক্ষে কইল?’ হি ওয়াজ সো কিউট। কাউকে সে ভয় পেত না।

আমি সরদার বলছি : সরদার ফজলুল করিম, অশ্বেষা প্রকাশন, ২০১৬, ৪০-৪১ পৃষ্ঠা

আজহারউদ্দীন খান

প্রতিভা যাকে স্পর্শ করে তাকেই সজীব করে-কথাটা শিবনাথ শাস্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে বলেছিলেন। মুনির চৌধুরীর সাহিত্যকৃতি আলোচনা করতে গিয়ে কথাটা বিশেষ করে মনে পড়লো। তিনি সাহিত্যের প্রতিটি বিভাগে পদচারণা করেছেন। গল্প, প্রবন্ধ, সমালোচনা, ভাষাতত্ত্ব, নাটক সব বিষয়েই তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। বিধাতা তাকে বেশিদিনের আয়ু দেন নি। বাংলাদেশ সৃষ্টি হবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে গুপ্ত ঘাতকের হাতে মাত্র ছেচল্লিশ বছর বয়সে তিনি নিহত হন। বিধাতা প্রদত্ত সামান্য আয়ুর খবর তিনি আগে থেকে জানতেন কিনা জানি না। তবে সাহিত্যের সব বিভাগে তার পদচারণা একথাই প্রমাণ করে যে, তিনি সব বিভাগেই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন এমনভাবে সুমুদ্রিত করে দিচ্ছিলেন যা পাঠ করতে গিয়ে অনাগত

কালের পাঠকরা তাঁর মতো শক্তিমান প্রতিভার অকাল বিয়োগের বেদনায় ব্যাকুল হয়ে পড়বেন। সাহিত্যের প্রতিটি বিভাগে তাঁর ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া একটি অস্থিরমতি বালকের কথা মনে করিয়ে দেয়। অথচ সাহিত্যের কোনো শাখাতেই তিনি বালকোচিত অপরিপক্বতার পরিচয় দেন নি, সর্বক্ষেত্রেই পরিপক্ব মনীষার পরিচয় দিয়েছেন। মুনির চৌধুরীর সাহিত্য সাধনার ফলশ্রুতি হলো এই। গল্প দিয়ে তিনি তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু করেছিলেন, প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হবার আগেই গুটিকয় গল্প লিখে চলে গেলেন তুলনামূলক সমালোচনা সাহিত্যে। সেখানে কিছু চর্চা করে চলে গেলেন ভাষাতত্ত্বে, ভাষাতত্ত্ব থেকে এলেন নাটকে- আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে হয়তো আবার একটা বিভাগে চলে যেতেন। এই যে একটা থেকে আর একটাতে যাওয়া কোনো চেষ্টা করে তাঁকে অধিগত করতে হয় নি, রচনা পড়লেই মনে হয় স্বতঃস্ফূর্ততায় অনায়াস দক্ষতায় যাওয়া আসা করেছেন। কোনো ক্ষেত্রেই তিনি স্বক্ষেত্র বলে মেনে নেন নি, কোনো কিছুই তাকে তৃপ্তি দেয় নি অথচ যে কোনো একটি ক্ষেত্রে নিজেকে নিবদ্ধ রাখতেন। সেটিই তাঁকে অমরতা দিতে পারতো। অতৃপ্ত জীবনই শিল্পীর কাম্য চরৈবেতি শিল্পীর লক্ষ্য। মুনির চৌধুরীর জীবন ও সাহিত্য এই কথারই প্রতিধ্বনি।

দীপ্ত আলোর বন্যা : আজহারউদ্দীন খান, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯, ৪৫০ পৃষ্ঠা



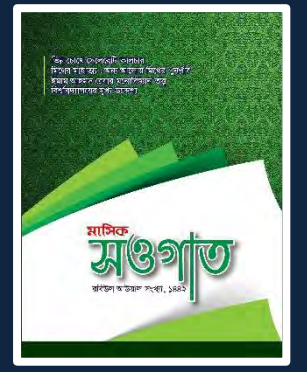
মহররম সংখ্যা

ডাউনলোড



সফর সংখ্যা

ডাউনলোড



রবিউল আউয়াল সংখ্যা

ডাউনলোড

ফেসবুক গ্রুপ

সাহিত্য সংগাতের ফেসবুক গ্রুপে যুক্ত হয়ে আপনিও হয়ে যান সংগাত পরিবারের

<https://www.facebook.com/groups/sowgat>

বিজ্ঞপ্তি

সাহিত্য সংগাত জমাদিউল আউয়াল সংখ্যায় যারা লিখতে চান তারা গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ বা ভ্রমণ কাহিনী লিখে ১২ ডিসেম্বরের মধ্যে ই-মেইল করুন নিচের ঠিকানায়:

sowgat.ms@gmail.com

“ আমরা তিনটি উপায়ে প্রজ্ঞা লাভ করি: প্রথমত, গভীর চিন্তা বা অনুধ্যানের মাধ্যমে যেটা মহত্তম উপায়; দ্বিতীয় যে উপায়ে প্রজ্ঞা লাভ করি সেটা হলো অনুকরণ, যেটা সহজতম; আর তৃতীয় উপায় হচ্ছে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, যেটা সবচেয়ে তেতোময়

কনফুসিয়াস

”